অর্শের যন্ত্রণা!!

অর্শরোগে ভুক্তভোগীই অর্শের যন্ত্রণার পরিমাণ বুঝিতে পারেন। আর পারেন—যিনি তাঁহার পরিচর্য্যা করিয়াছেন। দুর্লভ মানব জীবনের সুখ স্বচ্ছন্দ নষ্ট করিবার জন্য যত প্রকার রোগ সৃষ্টি হইয়াছে, অর্শ যেন তাহাদের সকলকে পরাভব করিয়াছে। মলদ্বারে সর্ব্বদাই টনটনানি, মলত্যাগকালে অসহ্য যন্ত্রণা, মলত্যাগান্তে যাতনার অনিবৃত্তি, প্রচুর রক্তস্রাব, মলদ্বারে বিদারণবৎ দারুণ যাতনা—সেই সঙ্গে শরীর ও মনের অস্বচ্ছন্দতা উপস্থিত হইয়া রোগীকে আরও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। আজকাল কলিকাতায় অনেক মান্দ্রাজী অর্শ-চিকিৎসক দেখা দিয়াছে। অনেকে রোগারোগ্য কামনায় তাহাদের হাতে পড়িয়া আরও নূতনবিধ উপসর্গ ও যন্ত্রণার অধীন হন। আপনাকে একটী সদুপদেশ দিই। অর্শ হইয়াছে বলিয়া নিরাশ হইবেন না, বা লক্ষ্যহীন চিকিৎসা এবং টোটকা টুটকী দ্বারা তাহার উপশম চেষ্টা করিবেন না। পথ্যাপথ্য পুস্তকের নিয়মের সহিত আমাদের "অর্শোহর বটিকা" নিয়মিত ব্যবহার করুন। ইহা সেবনে, বহির্ব্বলি ও অন্তর্ব্বলিজাত সর্ব্ববিধ যন্ত্রণাদায়ক অর্শ ও উল্লিখিত উপসর্গগুলি বিদূরিত হইবে।

১ এক কৌটা বটিকার মূল্য	...	১।০ পাঁচ সিকা।
ডাকমাশুলাদি	...	।০ চারি আনা।

হায়! সকলেই ঘৃণায় মুখ ফিরায়!

কুষ্ঠ রোগী! তোমার ন্যায় ভাগ্যহীন জীব আর জগতে নাই। যে স্পর্শাক্রামক তোমার শরীরকে তিলে তিলে ধ্বংস করিতেছে, তাহার পরিণাম অতি শোচনীয়। হায়! তোমাকে দেখিলে সকলেই ঘৃণায় মুখ ফিরায়। স্ত্রী পুত্র পরিজন দায়ে পড়িয়া সেবা করে। তাহাদেরও সাবধানে সন্তর্পণে থাকিতে হয়। তোমার রাত্রে নিদ্রা নাই, শয়নে স্বস্তি নাই, আহারে সুখ নাই, জীবন অতি ভারবহ। হায়! রোগের প্রথম হইতে যদি তুমি সুচিকিৎসা করাইতে, তাহা হইলে হয়তঃ আজ এ শোচনীয় পরিণাম হইত না। নিদারুণ বাতরক্ত রোগ হইতেই কুষ্ঠ রোগের উৎপত্তি। বাতরক্ত রোগে শরীরের সমস্ত শোণিত বিষাক্ত হইয়া উঠে। গায়ে চাকা চাকা দাগ, স্ফোটক, কষ্টদায়ক পীড়কা, শিরোবেদনা, মোহ, জ্বর, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, কম্প, প্রভৃতি উপসর্গ আসিয়া দেখা দেয়; শেষ সাংঘাতিক কুষ্ঠরোগ আক্রমণ করে। কুষ্ঠ রোগের ঔষধ নাই বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। অন্য চিকিৎসা-শাস্ত্রে কুষ্ঠরোগের ঔষধ না থাকিতে পারে, কিন্তু আমাদের আয়ুর্ব্বেদীয় শাস্ত্রে ইহার ঔষধের অভাব নাই। আমাদের "শোণিত শোধক"

নিজগুণে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। সর্ব্ববিধ বাতরক্ত ও কুষ্ঠরোগে ইহা অদ্বিতীয় মহৌষধ। অনেক চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগী, ইহা সেবনে নিরাময় হইয়াছে।

দুই সপ্তাহের ব্যবহারোপযোগী দুই প্রকার
ঔষধ ও এক প্রকার তৈলের মূল্য ... ৪৲ চারি টাকা।
ডাকমাশুল ও প্যাকিং ... ॥৵০ এগার আনা।

প্রমেহবিন্দু

আমাদের প্রমেহবিন্দু সর্ব্ববিধ মেহ ঘটিত রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। সাধারণের অনায়াসলব্ধ করিবার জন্য অনেক দেখিয়া শুনিয়া, এই অব্যর্থ-ফলপ্রদ, আশুমন্ত্রশক্তি সম্পন্ন প্রমেহবিন্দু আবিষ্কার করিয়াছি। এরূপভাবে ঔষধটীর মিশ্রকরন হইয়াছে যে, প্রমেহের নূতন ও পুরাতন উভয়বিধ অবস্থাতেই ইহার ব্যবহার চলিতে পারে। প্রস্রাবকালে জ্বালা-যন্ত্রণা, ঘোলা খড়ির মত প্রস্রাব, মুহুর্মুহুঃ প্রস্রাবের বেগ, সপূয় ও রক্তমিশ্রিত ধাতুনির্গম, যৌবন-স্বভাবসুলভ দোষজনিত অপরিমিত শুক্রক্ষয়, দৌর্ব্বল্য শিরোঘূর্ণন, শুক্রমেহ, মধুমেহ, স্বপ্নবিকার, বহুমূত্র মূত্রকৃচ্ছ্র এবং সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক ও "ঔপসর্গিক মেহের," প্রতিকার—অব্যর্থ "প্রমেহবিন্দুর" দ্বারাই ঘটিয়া থাকে। শরীরকে বিষশূন্য ও নির্দ্দোষ করিতে ইহা অদ্বিতীয়। শত শত স্থলে পরীক্ষা করিয়া, ইহার প্রয়োগে আশাতীত ফল পাইয়াছি।

একটী অনুরোধ।—যদি আপনি কখন এই কুৎসিত গোপনীয় রোগে আক্রান্ত হন, যদি লজ্জার জন্য এই রোগের কথা পারিবারিক চিকিৎসককে আপনার পরিবারকেও বলিতে সঙ্কুচিত হন,—আপনার বিশ্বস্ত বন্ধুকেও এতদ্বিষয় জানিতে দিতে অনিচ্ছুক হন, পরিজনবর্গকেও জানাইতে বাসনা না থাকে, অথচ নির্দ্দোষভাবে ও গোপনে অর্থাৎ কাহারও সন্দেহচক্ষে না পড়িয়া রোগমুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তবে রোগ প্রকাশমাত্রই আমাদের উপর বিশ্বাস করিয়া, "প্রমেহবিন্দু"র জন্য পত্র লিখুন,—দেখিবেন,—কত সহজে, কত গোপনে, আপনার মনের মহা অশান্তিকর এই রোগ আরাম হইয়া যাইবে।

মূল্যাদি।—এক শিশি প্রমেহবিন্দু ও এক কৌটা সেবনীয় বটিকার মূল্য ১॥০ দেড় টাকা। ডাক-মাশুল ও প্যাকিং ।৶০ সাত আনা।

গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত,

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজ.

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, টেরিটিবাজার, কলিকাতা।

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানীর অপূর্ব্ব আবিষ্কার।

সুরমা

সুরমা মর্ত্তের পারিজাত!

স্বর্গের পারিজাতের রং কেমন, গন্ধ কেমন, আকার কেমন, তাহা কেহ জানেন না। তবে পারিজাতের গন্ধটা যে খুব মন মাতান, তার আর কোন সন্দেহ নাই। আপনি যদি এই অদৃষ্টপূর্ব্ব পারিজাতের প্রত্যক্ষ সৌরভ কতকটা ধারণায় আনিতে চান, তবে আমাদের মনোমদ সুগন্ধময় সুরমা ব্যবহার করুন। আমরা ভরসা করিয়া বলিতে পারি, অতুলনীয় সুগন্ধে আমাদের সুরমা মর্ত্তের পারিজাত। "সুরমা" সকলগুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অথচ সুলভ সুগন্ধি কেশতৈল।

মূল্যাদি।—বড় এক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা। ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৶০ সাত আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা। ডাকমাশুলাদি ৸৶০ তের আনা।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বদেশী এসেন্স।

বকুল।—আমাদের বকুলের সৌরভ টাট্‌কা বকুল ফুলের মতই অটুট সুন্দর।

দিল্ অব্ রোজ্।—ইহার সৌরভ কেমন, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। বস্তুতঃ ইহা একটী অপূর্ব্ব ও অতুলনীয় সামগ্রী।

গোলাপ সার।—নামমাত্রেই ইহার গুণের পরিচয় পাওয়া যায়।

বঙ্গমাতা।—বাঙ্গালার "বঙ্গমাতা" সমস্ত বাঙ্গালার গৌরবস্বরূপ।

খস্ খস্।—প্রখর গ্রীষ্মের দিনে খস্‌খসের মত এমন আরামপ্রদ এসেন্স আর নাই।

চামেলী।—চামেলীর সৌরভ বড় স্নিগ্ধ বড় মধুর।

প্রত্যেক পুষ্পসার বড় এক শিশি ১৲ এক টাকা। মাঝারি ৸০ বার আনা। ছোট ৷৷০ আট আনা। প্রিয়জনের প্রীতি-উপহার জন্য একত্রে বড় তিন শিশি ২৷৷০ আড়াই টাকা। মাঝারি তিন শিশি ২৲ দুই টাকা। ছোট তিন শিশি ১।০ পাঁচ সিকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র। আমাদের ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার এক শিশি ৸০ বার আনা, ডাকমাশুল ।৴০ পাঁচ আনা। অডিকলোন ১ শিশি ৷৷০ আট আনা। মাশুলাদি ।৴০ পাঁচ আনা। আমাদের অটো ডি রোজ, অটো অব্ নিরোলী, অটো অব্ মতিয়া ও অটো অব্ খস্‌খস্ অতি উপাদেয় পদার্থ। প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা, ডজন ১০৲ দশ টাকা।

মিল্ক্ অব রোজ্।—ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায়। ব্রণ, মেচতা, ছুলি

ত্রিগুণ ও ত্রিদোষ।

বহুকাল পরে আবার আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্তি হইবার সময় আসিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদের আবির্ভাব কালের, আর বর্ত্তমান সময়ের, মধ্যবর্ত্তী কাল—অতি দীর্ঘ। এই মহৎ কালচক্রের আবর্ত্তনে, আয়ুর্ব্বেদের উপর দিয়া কত যুগ যুগান্তর চলিয়া গিয়াছে। এক সময়ে—আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা—জগতের শ্রেষ্ঠ বস্তু ছিল। যখন জগতের অন্যান্য দেশ অজ্ঞান-রূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, সেই প্রাচীনতম কালেও ভারতে আয়ুর্ব্বেদের চরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। রোগের কঠোর যন্ত্রণায়, লোকক্ষয়কর মহা-মারীর প্রভাবে, যখন জগতের অন্যান্য দেশের অধিবাসীগণ নিরুপায় ভাবে—শমনের অতিথি হইত, সেই স্মরণাতীত কালেও—আয়ুর্ব্বেদ—সুমধুর উপ-দেশ দিয়া—ভারতবাসীর স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন রাখিয়াছিল। য়ুরোপীয় পণ্ডিত-মণ্ডলী যে ঋগ্বেদকে জগতের প্রথম গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সেই ঋগ্বেদের সময়েও—আয়ুর্ব্বেদের সম্মান ছিল। ঋগ্বেদে—আমরা "হৃদ্রোগ" "হরিমাণ রোগ" এবং "শ্বেতি রোগের" পরিচয় পাই। কোনও সময়ে—যুদ্ধস্থলে খেলের স্ত্রী বিশ্পলার একটী পা ভাঙ্গিয়া যায়, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এক রাত্রির মধ্যেই—বিশ্পলাকে "লৌহময়ী জঙ্ঘা" পরাইয়া দিয়াছিলেন। কাক্ষীবানের কন্যা কুষ্ঠরোগিনী ছিলেন, এই জন্য পরিণত বয়সেও তাঁহার বিবাহ হয় নাই। পরে অশ্বিনীকুমারের কৃপায় রোগমুক্ত হওয়ায়—বৃদ্ধ বয়সে তিনি পতিলাভ করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদের এই সব উপাখ্যানগুলি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, স্পষ্টই বুঝা যায়—ঋগ্বেদের সময়ও ভারতে "কায়চিকিৎসা" এবং "অস্ত্রচিকিৎসা" অনেক উন্নত ছিল।

আয়ুর্ব্বেদের অনুবলে—ব্রহ্মার ছিন্নমস্তক সংযোজিত হয়, ইন্দ্রের ভুজস্তম্ভ রোগ আরোগ্য হয়, সূর্য্য দন্তরোগ হইতে পরিত্রাণ পান, চন্দ্র যক্ষ্মারোগ হইতে মুক্ত হন, জরাগ্রস্ত চ্যবনমুনি নবযৌবন লাভ করেন। অশ্বিনী-কুমারদ্বয় এই সকল দেবগণকে চিকিৎসা করিয়া, যজ্ঞাংশভোজী হইয়া-

ছিলেন। আয়ুর্ব্বেদের অপ্রতিম প্রভাব দেখিয়া—দেবগণও ইহা শিক্ষা করিয়াছিলেন। আধুনিক শিক্ষিত যুবকেরা—এই সকল কথা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভাবিয়া বিশ্বাস না করিতে পারেন, কিন্তু ইহাতে আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীনত্ব প্রমাণের ব্যাঘাত হয় না।

অশ্বিনীকুমার ও দেবগণ কর্ত্তৃক আয়ুর্ব্বেদ প্রচারের সময়কে, আমরা আয়ুর্ব্বেদের প্রথম যুগ বলিতে পারি। ইহার পর আয়ুর্ব্বেদের দ্বিতীয় যুগ। তখন, মুনিশ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজের নিকটে, অগ্নিবেশ প্রভৃতি লোকহিতৈষী ঋষিগণ আয়ুর্ব্বেদের উপদেশ লইতেছিলেন। স্বয়ং ধন্বন্তরি বিবিধ অস্ত্রচিকিৎসার কৌশল উদ্ভাবনে ব্যাপৃত ছিলেন। তা'র পর আয়ুর্ব্বেদের তৃতীয় যুগ। এই সময়ে, চরক সুশ্রুত প্রভৃতি মনস্বীগণের প্রাদুর্ভাবে—আয়ুর্ব্বেদের 'কায় চিকিৎসা' 'শল্য চিকিৎসা' কত উন্নত! নাড়ীজ্ঞান ও অরিষ্ট লক্ষণের অনুশীলনে, লোকে ছয় মাস পূর্ব্বে নিজের মৃত্যু জানিতে পারায়, এক রকম স্বেচ্ছামৃত্যু লাভ করিয়া, মুক্তির পথে অগ্রসর হইতেছিল।

চক্রপাণি, জেজ্জড় ও গয়দাস প্রভৃতির আবির্ভাব কাল—আয়ুর্ব্বেদের আর এক যুগ। তখনও আয়ুর্ব্বেদের রসায়ন বিদ্যা প্রভাবে লোক দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারিত। তখনও রসায়ন তত্ত্ববিদ্ ভিষক সম্প্রদায়, কৌশলে—ধাতু উপধাতু বিষ উপবিষ, রত্ন উপরত্ন বাছিয়া লইয়া ঔষধস্কন্ধের পুষ্টিসাধন করিতেছিলেন।

ইহার পর আয়ুর্ব্বেদের আর এক যুগ। বলিতে দুঃখ হয়—ইহাই আয়ুর্ব্বেদের অবনতির যুগ। সে বড় বেশী দিনের কথা নয়—যে দিন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান—কল্পনাতীত আড়ম্বরের সহিত ভারত-বক্ষে পদার্পণ করিল, সেই দিন হইতেই ভারতবাসী আয়ুর্ব্বেদের মহিমা ভুলিয়া গেল! সেই দিন হইতেই নূতন প্রিয় মানবের কাছে পুরাতন অনাদৃত হইল।

ইংরাজের অভ্রভেদী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঔষধালয়—নীল, পীত, লোহিত বিবিধ বর্ণের জলপূর্ণ—সুবৃহৎ কাচপাত্র সম্মুখে রাখিয়া—আয়ুর্ব্বেদকে আপনার বীরদর্প দেখাইতে লাগিল! শিশি, গ্লাসকেশ, লেবেলাদির স্পর্দ্ধা দেখিয়া, কুটিরবাসী আয়ুর্ব্বেদের—সেই মৃত্তিকাপাত্রস্থ বন্য গুল্মের কাথ—অধিকক্ষণ আর তিষ্ঠিতে পারিল না। যে আয়ুর্ব্বেদ এতদিন

সৃষ্টিকর্ত্তার মুখনিঃসৃত বলিয়া সম্মানের সামগ্রী ছিল, ভাগ্যবিপর্য্যয়ে কাল-বিপর্য্যয়ে এবং শিক্ষাবিপর্য্যয়ে সেই আয়ুর্ব্বেদ—নিত্য পরিবর্ত্তনশীল বিলাস-ব্যসনানুরক্ত মনুষ্য প্রচারিত "এলোপ্যাথীর" আবর্ত্তে পড়িয়া ডুবিয়া গেল! হতভাগ্য ভারতবাসী আর ভাবিবারও অবসর পাইল না—বাহ্য সৌন্দর্য্যের মধ্যে আত্ম অস্তিত্ব বিসর্জ্জন দিল।

এখন আবার আয়ুর্ব্বেদের যুগান্তর উপস্থিত। অতীতের প্রতি অনুরাগ স্বাভাবিক বলিয়াই হউক, কিম্বা যে কোনও কারণেই হউক, বিদেশী চিকিৎসার একান্ত অনুরাগী হইয়াও বহুদিন পরে ভারতবাসী আবার—প্রাচীন মতের অনুবর্ত্তনে উন্মুখ হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ আবার—অল্পে অল্পে পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের চাকচিক্য ভেদ করিয়া স্বীয় ক্ষীণতম কিরণ বিকীর্ণ করিতে সমর্থ হইতেছে। এই আপাত প্রমোদপ্রিয়তার রাজত্বে, ভস্মধূসরিত বিকট জটাবেষ্টিত বৃদ্ধ ঋষির কথায় দুই একজন আবার কর্ণপাত করিতেছেন। কাবাব কাট্‌লেটের মমতা ছাড়িয়া, কেহ কেহ বা ঋষিহস্ত-প্রসারিত—পল্‌তার ডাল্‌নারূপ অমৃত প্রসাদের ভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ডাক্তারের উন্নতিকল্পে—রাজার কত সহানুভূতি, কত মেডেল, কত ঔষধ; সে সব ছাড়িয়া—অস্থিচর্ম্মাবশেষ ভারতবাসী—আবার আয়ুর্ব্বেদের উপাসনা আরম্ভ করিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, বহুদিন পরে আবার আয়ুর্ব্বেদ আলোচনার সময় আসিয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য—স্বাস্থ্যরক্ষা করা। আর্য্য ঋষিগণ বলেন—বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা—এই তিনটী আমাদের শরীরে সমানভাবে থাকিলেই, আমরা সুস্থ থাকিতে পারি। আজ আমরা সেই বায়ু, পিত্ত ও কফের বিষয়েই কথঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ধর্ম্ম বলুন, অর্থ বলুন, কাম মোক্ষ যাহাই বলুন, শরীর ভাল না থাকিলে, কিছুই হয় না। স্বাস্থ্য সকলেই চায়; এ হেন স্বাস্থ্যরূপ অমূল্য রত্নকে—ভারতবাসী হারাইয়া ফেলিয়াছেন;—এ সময়ে বোধ হয় স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দুই চারিটা পুরাতন কথা পাড়িলে, বিশেষ অপরাধ হইবে না।

বায়ু, পিত্ত, কফই যে আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার মূল, এ প্রবন্ধে আমরা তাহাই দেখাইব। কিন্তু আলোচ্য বিষয়টী বড় গুরুতর, ইহাকে পরিস্ফুট

করিতে হইলে, আমাদের মত অজ্ঞানের অধিক বাগ্‌জাল বিস্তার করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে, অথচ এই প্রবন্ধে সেরূপ বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিবার অবসর নাই, সুতরাং অনেক বিষয় বাধ্য হইয়া কেবল স্পর্শ করিয়া যাইব মাত্র। শাস্ত্রদর্শী সুধীগণ, সেই অপূর্ণতা দোষ মার্জ্জনা করিলে কৃতকৃতার্থ হইব।

আমাদের শরীরের সঙ্গে—বায়ু পিত্ত ও কফের অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধ আবার—আমাদের শরীরের উৎপত্তি স্থিতি ও বিনাশের সঙ্গে জড়িত। যেমন বায়ু, সূর্য্য ও চন্দ্র, সঞ্চালন আকর্ষণ ও ক্ষরণ ক্রিয়ার দ্বারা এই জগৎরূপ বিরাট দেহ ধারণ করিয়া আছেন, বায়ু, পিত্ত ও কফ সেইরূপ—সঞ্চালন, আকর্ষণ ও ক্ষরণ ক্রিয়া দ্বারা—আমাদের দেহ রক্ষা করিতেছে। বাহ্য জগত ও দেহ জগত অভিন্ন। কিন্তু এ সকল কথা বুঝিতে হইলে সৃষ্টিরহস্যও বুঝিতে হয়। এই জন্য—সংক্ষেপে সৃষ্টিরহস্যের অবতারণা করিতেছি।

জগদীশ্বরের সৃষ্টি শক্তির নাম প্রকৃতি। জগতের যে কোনও পদার্থে যত গুণ ও যত শক্তি আমরা দেখিতে পাই, সে সব প্রকৃতিরই শক্তি। আমরা যে সব দ্রব্য আহার করি, যে শক্তিতে কার্য্য করি, সে সব প্রকৃতিরই রূপ। দার্শনিক পণ্ডিতেরা—প্রকৃতির সেই শক্তিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। সেই তিন ভাগের নাম সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ। ইহাদিগকে প্রকৃতির গুণ বলে। প্রকৃতির যে গুণের দ্বারা সৃষ্টি, চেষ্টা ও কার্য্য হয়, তাহার নাম রজোগুণ। ইহা অত্যন্ত চঞ্চল। রজোগুণেই প্রকৃতি সৃষ্টিতে পরিণত হয়। ইহার কার্য্যকারিতা শক্তি—সর্ব্বত্রই আমরা দেখিতে পাই।

প্রকৃতির যে গুণ জগৎকে পালন করে, সেই স্থিতিশীল উৎকৃষ্ট গুণের নাম সত্ত্বগুণ; আর যে গুণে জগৎ তেজোহীন ও শক্তি হীন হইয়া যায়, তাহাই তমোগুণ। এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতেই পঞ্চমহাভূতের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই পঞ্চ মহাভূতের নাম—পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, ও আকাশ।

পঞ্চ মহাভূত হইতেই আবার মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, বৃক্ষ, লতা

প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে। সকলেরই মূলে—সেই এক প্রকৃতির বিকাশ। আমাদের দেহ মন ও ইন্দ্রিয়— প্রকৃতিরই ব্যাপার। এক্ষণে দেখা যাউক —পঞ্চ ভূতের কোন্ কোন্ অংশ—আমাদের শরীরে কি কি ভাবে আছে।

পৃথিবী··· ··· ··· ·· মূর্ত্তি।
জল ··· ··· ··· ··· ক্লেদ।
অগ্নি ··· ··· ··· ··· তাপ।
বায়ু ··· ··· ··· ··· প্রাণ।
আকাশ ··· ··· ··· ছিদ্র সমূহ।

পৃথিবীর গুণ—গন্ধ, কঠিনতা ও গুরুতা; ঘ্রাণেন্দ্রিয়, মাংস, অস্থি, কেশ, লোম, চর্ম্ম, নখ ও বিষ্ঠা—এই গুলিকে আমাদের দেহের পার্থিব ভাগ বলা যায়।

রস, শীতলত্ব, স্নিগ্ধত্ব, গুরুত্ব, এবং দ্রবত্ব—এই সকল জলের গুণ। আমাদের রসনেন্দ্রিয়, শ্লেষ্মা, রস, রক্ত, বসা [চর্ব্বি], ঘর্ম্ম, মূত্র, ও শুক্র প্রভৃতি জলের বিকার। শ্লেষ্মায়—জলের এই সকল গুণ গুলিই দেখিতে পাওয়া যায়।

রূপ, উষ্ণতা, তীক্ষ্ণতা, দীপ্তি এবং পাক—এই কয়েকটী তেজের প্রসিদ্ধ গুণ; আমাদের শরীরস্থ পিত্ত নামক পদার্থে—এই গুণগুলি আছে। সুতরাং পিত্ত তৈজস পদার্থ।

স্পর্শ, লঘুতা, স্পন্দন এবং চেষ্টা—দার্শনিকেরা এই গুলিকে বায়ুর প্রধান গুণ বলেন। স্পর্শ শক্তি এবং উশ্বাস, নিশ্বাস, নিমেষ উন্মেষ, আকুঞ্চন প্রসারণ, গমন ও প্রেরণ—আমাদের শরীরের এই সকল ক্রিয়া শক্তি, বায়ুর গুণেই সম্পন্ন হয়।

ছিদ্র, শব্দ ও প্রকাশ—আকাশের এই তিনটী গুণ, আকাশের গুণেই আমাদের শরীর সম্বন্ধীয় শিরা, স্নায়ু, অস্থি ও পেশী সমূহ—পরস্পর পৃথক রূপে প্রকাশিত হয়। আকাশ হইতেই আমরা—শ্রবণেন্দ্রিয় এবং শারীরিক ছিদ্র সমস্ত পাইয়াছি।

বায়ুর গুণ দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, যে শক্তির দ্বারা আমাদের শারীরিক যন্ত্র সমূহের ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়—তাহাই আমাদের দৈহিক বায়ু।

এই বায়ু অত্যন্ত চঞ্চল—তমোগুণ ও চঞ্চল ধর্ম্মী—সুতরাং স্বীকার করিতে হয় যে বায়ুতে তমোগুণের ভাগ বেশী আছে। বৈদ্যগণ বায়ুর এই রূপ

বায়ুর স্বরূপ।

স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন; যথা—"বায়ু সূক্ষ্ম, রুক্ষ্ম, লঘু, শীঘ্রকারী এবং শীতল।" বায়ু সূক্ষ্ম বলিয়াই—কি করিয়া যে আমাদের শারীরিক ক্রিয়া বায়ুর সাহায্যে সম্পন্ন হয়, তাহা আমরা চক্ষে দেখিতে পাই না। অতি তরল রস [আহার জাত] ও যে ক্রমে ক্রমে কঠিন অস্থিতে পরিণত হয়, ইহা বায়ুর রুক্ষতা গুণে। লঘু বলিয়াই বায়ু চঞ্চল। ইহার শীঘ্রকারিতা গুণে—আমাদের ইন্দ্রিয় শক্তি প্রভৃতির পটুতা জন্মে। বায়ু শীতল বলিয়া—ইহাতে কম্পন শক্তি প্রচুর পরিমানে আছে।

এক মাত্র বায়ুই আমাদের শরীরে—কার্য্যভেদে পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে যথা—প্রাণবায়ু, উদানবায়ু, সমানবায়ু, ব্যানবায়ু ও অপানবায়ু। শ্বাস প্রশ্বাস কালে যে বায়ু—দেহের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহার নামই

প্রাণ বায়ুর স্থান ও কার্য্য।

প্রাণ বায়ু। মস্তক, বক্ষঃস্থল, কণ্ঠ, জিহ্বা, মুখ ও নাসিকা, প্রাণবায়ু শরীরের এই সকল স্থান আশ্রয় করিয়া থাকে। তন্মধ্যে বক্ষঃস্থলই ইহার প্রধান স্থান। যে আহার আমাদের জীবন রক্ষার প্রধান কারণ, প্রাণবায়ুই তাহাকে উদরে লইয়া যায়। নিষ্ঠীবনত্যাগ, উদ্গারওঠা, হাঁচি, এ সব প্রাণবায়ুরই কার্য্য। প্রাণবায়ু বিকৃত হইলে—হিক্কা ও শ্বাস প্রভৃতি রোগ জন্মে। এই জন্যই হিক্কা ও শ্বাস রোগে—রোগীর বাঁচিবার আশা প্রায়ই থাকে না।

শ্বাস প্রশ্বাস কালে, যে বায়ু শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়, তাহার নাম উদান বায়ু। কণ্ঠ, বক্ষঃ, ও নাভি উদান বায়ুর এই তিনটী নির্দ্দিষ্ট

উদান ও সমান বায়ুর স্থান ও কার্য্য।

স্থান। কণ্ঠই ইহার প্রধান আশ্রয়। ইহার সাহায্যেই আমরা কথা কহিতে পারি এবং গান গাহিতে পারি। উদান বায়ু কুপিত হইলে, প্রায় স্বরভঙ্গাদি রোগ জন্মিতে দেখা যায়। যে বায়ু আমাশয়ে ও অন্ত্রের মধ্যে বিচরণ করিয়া বেড়ায়, তাহাকে সমান বায়ু বলা যায়। এই বায়ু পাচকাগ্নিকে প্রজ্বলিত করে। ভক্ষ্যদ্রব্য জীর্ণ হইয়া গেলে, তাহা

হইতে যে রস ও মল উৎপন্ন হয়, সমান বায়ু তাহা পৃথক করিয়া দেয়। ইহা কুপিত হইলে অগ্নিমান্দ্য, অতিসার এবং গুল্মাদি রোগ জন্মে।

যে বায়ু আমাদের সর্ব্ব দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকে, বৈদ্যগণ তাহাকে ব্যান বায়ু বলেন। এই বায়ুর গতি শক্তি অতি দ্রুত। ইহারই সাহায্যে আমাদের শব্দ ও স্পর্শাদি ইন্দ্রিয় কার্য্য এবং আকুঞ্চন প্রসারণাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। রক্তস্রাব, ঘর্ম্মস্রাব, গমনশক্তি, উন্মেষ নিমেষ—এ সকল কার্য্য ব্যান বায়ুর সাহায্যেই হয়। দেহীদিগের সকল কাজেই প্রায় ইহার সম্বন্ধ আছে। সকল দেহে থাকে বলিয়া, ইহা কুপিত হইলে, সর্ব্বাঙ্গগত রোগ [যেমন জ্বর] জন্মিয়া থাকে।

ব্যান বায়ুর স্থান ও কার্য্য।

তলপেট, নাভি, উরু, মূত্রদ্বার ও মলদ্বার—এই গুলি অপান বায়ুর নির্দ্দিষ্ট স্থান। ইহার কার্য্য—মল, মূত্র, বায়ু, শুক্র এবং আর্ত্তব প্রভৃতিকে অধঃ প্রেরণ করা। অপান বায়ু কুপিত হইলে, মেহ, শুক্রদোষ, এবং গুহ্য দেশ সংক্রান্ত বহুবিধ ব্যাধি উৎপাদন করিতে পারে। অপান বায়ুর সাহায্যেই রমণীগণ প্রসব করিতে পারে।

অপান বায়ুর স্থান ও কার্য্য।

বায়ু প্রকৃতিস্থ ভাবে আমাদের শরীরে থাকিলে, শারীরিক ক্রিয়া এবং রস রক্তাদির অবস্থা সমান থাকে। পিত্ত, শ্লেষ্মা, ও রস রক্তাদি ধাতু সমূহ নিশ্চল, বায়ুই তাহাদিগকে যথা স্থানে প্রেরণ করে, বায়ু তাহাদিগকে কুপিত ও দূষিত করে। উহাদের নিজের কোনও শক্তি নাই, বায়ুর শক্তিই উহাদের অবলম্বন। এই জন্যই চরক ঋষি বায়ুকে, জীবের পরমায়ু বলিয়াছেন।

আমাদের দেহে ১৭৫টী বায়ু বাহিনী শিরা আছে। বায়ু এই সকল শিরায় সর্ব্বদাই বিচরণ করে। ইহাদের বর্ণ—অরুণ।

"বা" ধাতুর অর্থ গতি এবং গন্ধ প্রকাশ বুঝায় তাহার উত্তর "উণ্" প্রত্যয় (ব-উণ্-যে) করিয়া বায়ু শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

পিত্ত—পূতিগন্ধময় পীত বর্ণ তরল পদার্থ। আমরা পূর্ব্বে ইহাকে তৈজস পদার্থ বলিয়াছি। তেজের ভাগ বেশী আছে বলিয়াই—ইহা উষ্ণ ও তীক্ষ্ণ। উষ্ণতা গুণেই--পিত্তে আমাদের শারীরিক তাপ রক্ষা করিতে

পারে। তাপ না থাকিলে—মানুষ বাঁচে না। এই তাপকেই ডাক্তারেরা "য়্যানিমেল্ হিট" বলেন। শ্লেষ্মার শৈত্য শক্তিতে আচ্ছন্ন হইলে, এই তাপ কমিয়া যায়, এ অবস্থায় মানুষ অধিক-

পিত্তের স্বরূপ।

ক্ষণ বাঁচিতে পারে না। এই তাপ—জ্বরে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। সুতরাং জ্বর মাত্রেই পিত্তাত্মক। এই জন্যই বোধ হয় পিত্তনাশক তিক্ত দ্রব্য সেবনে জ্বর নষ্ট হইয়া থাকে। ক্রোধ, সাহস প্রভৃতি বৃত্তিগুলিতে পিত্তের উত্তেজনা আছে। সুতরাং পিত্তও রজোগুণাত্মক। আয়ুর্ব্বেদবেত্তারা পিত্তকে অম্লরস বিশিষ্ট পদার্থ বলেন। অম্লরসের—পাচকতা ও জারকতা গুণ আছে। এই জন্যই পিত্ত আমাদের ভক্ষ্য দ্রব্যকে জীর্ণ করিতে পারে। কাহারও মতে—পিত্ত আস্বাদনে কটু। কটু রসের দাহশক্তি আছে, পিত্তেরও দাহশক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের বোধ হয়—পিত্ত বিকৃত হইলেই কটুরস হয়। পিত্তের বিকারে—যখন আমাদের অজীর্ণ ও অম্লাদি পীড়া জন্মে, তখন প্রায়ই গলা জ্বালা করিতে থাকে।

পিত্তের তীক্ষ্ণ গুণ আছে বলিয়াই—আমাদের ক্ষুধা তৃষ্ণার উদ্রেক হইয়া থাকে। ক্ষুধার সময় আহার না করিলে এবং পিপাসার সময় জল পান না করিলে, পিত্ত কুপিত হইয়া আমাদের সমস্ত ধাতুকেই পরিপাক করিতে পারে। তাহাতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিবার সম্ভাবনা। পিত্ত যখন আগ্নেয় পদার্থ, তখন উপযুক্ত ইন্ধন না পাইলে, রস রক্তাদিকে যে দগ্ধ করিয়া ফেলিবে তাহার আর সন্দেহ কি? কেহ কেহ পিত্তকেই আমাদের দৈহিক অগ্নি বলেন, কেননা দাহনশক্তি ও পরিপাক শক্তি উভয়েরই আছে। অগ্নি রুক্ষ ও ঊর্দ্ধগামী—পিত্ত—তরল ও অধোগামী, উভয়ের এই বিপরীত গুণ দেখিয়া—কেহ কেহ পিত্তকে অগ্নি বলিয়া স্বীকার করেন না। কিন্তু সুশ্রুত বলেন যখন পিত্ত ভিন্ন জীবশরীরে দ্বিতীয় অগ্নির সত্তা বুঝিতে পারা যায় না, তখন পিত্তকেই অগ্নি বলিতে ক্ষতি কি?" আমরাও এই মতের অনুমোদন করি। পিত্ত ও অগ্নি যদি পৃথক্ হইবে, তাহা হইলে আমাদের দেহে অগ্নিমান্দ্য ঘটিলে, পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্য ভক্ষণ করিবামাত্র ঐ অগ্নির বৃদ্ধি হয় কেন? "দ্রব্যের সমানতাই তাহার বৃদ্ধির কারণ"

দার্শনিকেরাও ইহা স্বীকার করেন। পরিপাক শক্তি—পিত্তে প্রতিষ্ঠিত আছে বলিয়াই—আহার অভাবে পিত্ত আমাদের শারীরিক সমস্ত উপাদান-গুলিকে পরিপাক করিতে পারে। এই জন্যই চরক বলেন—"অরুচি হইলেও অন্নকালে আহার করিবে।" জ্বর-রোগীকে উপবাস দেওয়ান একান্ত কর্ত্তব্য হইলেও মধ্যাহ্নে [পিত্তের সময়ে] কিছু খাওয়ান চাই। নহিলে রোগীর মোহ ঘটিতে পারে। বাস্তবিক পিত্ত অতি ভয়ানক। পিত্তকে দমন করিবার জন্য—রোগীর যদি পথ্যে রুচি না থাকে, তাহা হইলে অপথ্যও দিতে পারা যায়, পণ্ডিতগণ ইহা বলিয়াছেন।

পিত্ত পীতবর্ণ বলিয়া—ইহার বৃদ্ধি হইলে মনুষ্যের মলমূত্র নেত্র ও দেহের বর্ণ হরিদ্রা বর্ণ হইয়া যায়। কুপিত পিত্তের স্বধর্ম্ম হেতু—ভুক্ত দ্রব্য যখন বমন হয় সেই বমন প্রায়ই হরিৎ বর্ণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। এই জন্য কেহ কেহ পিত্তকে নীল বর্ণও বলেন। বায়ুর মত পিত্তও আমাদের শরীরে পাঁচ ভাগে বিভক্ত।

পাচক পিত্তের স্থান ও কার্য্য।

কার্য্য ভেদে—পিত্তের নামও পাঁচটী। যথা পাচক, রঞ্জক, সাধক, আলোচক ও ভ্রাজক। পাচক পিত্ত আমাশয় ও মলাশয়ের মধ্যস্থানে থাকিয়া, ভক্ষিত দ্রব্যকে পরিপাক করিয়া দেয়। অপর চারিটী পিত্ত—ইহার শক্তিতেই উত্তেজিত হয়। এই জন্যই পাচকপিত্ত সকল পিত্তের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। "রঞ্জক" পিত্ত—যকৃত ও প্লীহার মধ্যে অবস্থিতি করে। আহার জাত রস, যখন যকৃৎ ও প্লীহায় আসিয়া উপস্থিত হয়, রঞ্জক পিত্ত সেই রসকে রক্তবর্ণে রঞ্জিত করে।

রঞ্জক পিত্তের স্থান ও কার্য্য।

এইরূপ রস রূপান্তর প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে রক্ত বলা যায়। এই রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা এবং মজ্জা হইতে শুক্র উৎপন্ন হয়। সুতরাং এস্থানে বলিতে পারা যায় যে, যে রক্ত আমাদের শরীরের একটী শ্রেষ্ঠ উপাদান, পিত্তই তাহার জন্মদাতা।

সাধক পিত্তের স্থান ও কার্য্য।

"সাধক" নামক পিত্তের স্থান—হৃদয়ে। ইহার দ্বারা আমাদের বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতি শক্তি উৎপন্ন হয়। আমাদের মনের সকল অভিলাষই—এই সাধক পিত্তের প্রভাবে সাধিত হইয়া থাকে।

"আলোচক" নামক পিত্ত—চক্ষুতে অবস্থিতি করে। ইহার শক্তিতেই আমরা দর্শনীয় বস্তু ও তাহাদের রূপাদি দেখিতে পাই। যে পিত্ত আমাদের সর্ব্ব শরীরস্থ চর্ম্মে অবস্থিত, তাহার নাম "ভ্রাজক"। শরীরের উত্তাপ রক্ষা—ইহার প্রধান কার্য্য। আমরা স্নানের সময়, যে সকল তৈলাদি মর্দ্দন করি, কিম্বা শরীরে যে সকল চন্দনাদি প্রলেপ দিই, এই ভ্রাজক পিত্তই তাহাদের রস আকর্ষণ করে।

আলোচক এবং ভ্রাজক পিত্তের স্থান ও কার্য্য।

আমাদের শরীরে পিত্ত বাহিনী শিরাও ১৭৫টী আছে। ইহাদের বর্ণ নীল এবং স্পর্শ করিলে উষ্ণ বোধ হয়। পিত্ত এই সকল শিরায় সর্ব্বদাই বিচরণ করে। পিত্ত প্রকৃতিস্থ থাকিলে, পরিপাক শক্তি, দৃষ্টিশক্তি, স্মরণ-শক্তি, লাবণ্য, যথাসময়ে ক্ষুধা তৃষ্ণার উদয়, এবং দেহের উত্তাপ অব্যাহত ভাবে থাকে।

"তপ" ধাতুর অর্থ "সন্তাপ"। ইহার উত্তর ইচ্ প্রত্যয় করিয়া পিত্ত শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

চুঁচুড়া। শ্রীব্রজবল্লভ রায়।

শিক্ষার সুবিধার জন্য ছাত্র কর্ত্তৃক

দেশভ্রমণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমার পূর্ব্বপত্রে চাঁইবাসা সহরের অনেক সংবাদ পাইয়াছ। গত মঙ্গলবারে আহারাদি করিয়া, আমি ও সামন্ত হাট দেখিতে গেলাম। প্রাতে উঠিয়াই দেখিতেছি, আমাদের বাঙ্গলার পার্শ্বের রাস্তা দিয়া কাতারে কাতারে লোক চলিয়াছে, জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলাম, সেদিন হাটবার, তজ্জন্য মফস্বলের ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম হইতে হাটে বেচাকেনা করিবার জন্য লোক আসিতেছে। হাটতলায় গিয়া দেখি বহুতর লোকের সমাগম

হইয়াছে; বোধ হয় ৫।৭ হাজার লোক হইবে। ইহাদিগের অধিকাংশই কৌপীনধারী অসভ্য কোল ও ওরাং। স্ত্রীলোকেরা ১॥ হাত পৌনে ২ হাত বহরের কাপড় পরিয়া আছে বটে, তবে কোমরের উপরের অংশ প্রায় অনেকেরই বস্ত্রাবৃত নহে। হাটে এইরূপ কোলের আমদানী দেখিয়া বুঝিলাম, আমরা কোথায় আসিয়াছি। বাঙ্গালী ২।১০ জন এবং হিন্দুস্থানী ও মাড়োয়ারী প্রভৃতি ৫০।৬০ জনের অধিক লোক দেখিলাম না। হাটে ধান ও চালের বহুৎ আমদানী দেখিলাম। ছোট ছোট টুক্‌রী করিয়া ১০।১৫ সের করিয়া ধান কিম্বা চাল মাথায় করিয়া বিক্রয় করিতে আনিয়াছে। অধিকাংশ চালই লাল লাল মোটা মোটা। ঘুরিতে ঘুরিতে একস্থানে বেশ পরিষ্কার সরু সরু চাল দেখিতে পাইলাম। সেই চালের দর জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু কাহাকে জিজ্ঞাসা করি? কোলেরা তাহাদের নিজের ভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষা জানে না ইহাদের ভাষার শব্দগুলি, সাঁওতালদের মত Monosyllabic। কেমন চড়াইয়া নামাইয়া, টুং টাং করিয়া আস্তে আস্তে ছোট ছোট কথা-গুলি বলে! ইহাদের ভাষা শুনিতে বেশ মধুর লাগে, কিন্তু তাহার মাথা মুণ্ড কিছুই বুঝিতে পারি না। এই দেশের গোয়ালা ও কাহার প্রভৃতি অধিবাসীরা হিন্দি ভাষা বুঝে ও ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দি কথা বলিতে পারে। এখানে আসিয়া এই এক ভাষা বিভ্রাটে পড়িয়াছি। ডিরেক্‌টার আমাদিগকে কৃষিকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া, কৃষি সম্বন্ধে নানা সংবাদ সংগ্রহ করিয়া, সেই বিষয় আলোচনা করিবার জন্য এখানে পাঠাইয়াছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই স্থানের অধিবাসীরা আমাদের ভাষা একেবারে বুঝে না বলিয়া, আমরা বিশেষ অসুবিধায় পড়িয়াছি। চাষবাস সম্বন্ধে কোন সংবাদ ইহাদিগের নিকট হইতে পাইবার উপায় নাই। চালের দর জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া, নিজেদের দুঃখের কথা, অসুবিধার কথা লিখিয়া ফেলিলাম। নিকটে এক জন মুসলমান আড়ৎদার দাঁড়াইয়াছিল। তাহার সাহায্যে অবগত হইলাম, টাকায় ৫ পালি করিয়া চাল বিক্রয় করিবে। তাহাদিগের এক পালিতে কত চাল ধরে, হাতের মুঠায় মাপিয়া একটা আন্দাজ করিয়া বুঝিলাম, সেই চালের মণ প্রায় ৮৲ টাকা করিয়া পড়িবে।

কোলেরা এখনও ওজন করিয়া জিনিস বিক্রয় করিতে শিখে নাই। তাহারা ঘর হইতে নিজেদের মনোমত এক একটা কাঠের পালি তৈয়ার করিয়া আনে, আর সেই পালির হিসাবে চালের দর বলিয়া থাকে। অনেক সময় সরু চাল ও মোটা চাল, টাকায় একই পরিমাণ দেয়। লোকগুলা কিরূপ বোকা দেখ। শুনিলাম ২ বৎসর পূর্ব্বে পর্য্যন্ত, এই হাট হইতে শত শত মণ চাল অন্যত্র রপ্তানী হইত। নানা দেশ হইতে চালের মহাজন আসিয়া এই হাট হইতে চাল খরিদ করিয়া বিদেশে চালান দেয়। কোলেরা ঝুড়ি করিয়া চাল হাটে আনিয়া দিয়াই খালাস। ব্যবসার তাহারা কি বুঝিবে।

হাটে তরিতরকারী কিরূপ আসিয়াছে, দেখিবার জন্য, অন্য অংশে গেলাম। তরকারীর মধ্যে কুদ্‌রী (আমাদের দেশের তেলাকুচার ন্যায় এক প্রকার বুনো ফল; তবে খাইতে তেলাকুচার মত তিক্ত নহে), বুনো কাঁকরোল, এক প্রকার শাক ও কাঁচা লঙ্কা। আমি হুগলি ও সামন্ত বর্দ্ধমান জেলার লোক; তরকারীর রকম দেখিয়া একবারে অবাক হইলাম। হাটে ২।৩ খানি মসলা ও লবণের দোকান বসিয়াছে। সমস্তই লিবারপুলের লবণ। কোলেরা ধান দিয়া লবণ ও মসলা খরিদ করে। টাকা পয়সা তাহারা কখনও বড় একটা চিনে নাই; অনেক সময়েই ধান দিয়া বেচাকেনা করে। দেশীয় তাঁতিরা হাটে মোটা সূতার কাপড় বিক্রয় করিতেছে। কাপড়গুলি চওড়ায় ১॥ হাত হইতে পৌনে ২ হাত; কিন্তু লম্বে ১০।১১ হাত পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। ছোট ছোট কাপড় ও নানা রকম গামছা দেখিলাম। ১০।১১ হাত একখানা কাপড়ের দাম ১৲ হইতে ১।০ পর্য্যন্ত। তবে সেই কাপড় দেখিলে মনে হয় যে এই কাপড় এক পুরুষে ছিঁড়িবে না, উত্তরাধিকারীকে উইল করিয়া যাইতে হইবে। একখানি মাত্র বিলাতী বস্ত্রের দোকান বসিয়াছে। বিলাতী কাপড় ইহারা প্রায়ই ব্যবহার করে না। পাত্‌লা ফিন্‌ফিনে কাপড় পরিয়া অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় থাকাকে ইহারা এখনও সভ্যতার চরম বলিয়া মনে করে না। ফরাসডাঙ্গা ও ঢাকার মিহি ধুতি পরিলে, কিসে যে বাবুগিরির চূড়ান্ত হয়, তাহা আমিও ভাল বুঝি না। কাঁচি ধুতি দেশ হইতে একেবারে উঠিয়া গেল। এখন

কাপড় যত মিহি হয়, ততই তাহার আদর অধিক, তাহাতে লজ্জা নিবারণ হয় ভালই, না হয় সোভি আচ্ছা!

কোলেদের মধ্যে বিলাসিতা এখনও ঢুকে নাই। সকল দেশের স্ত্রীলোকেরাই অলঙ্কার প্রিয়। এখানকার স্ত্রীলোকের মধ্যে অলঙ্কারের চলন বড় দেখা যায় না। পায়ে এক প্রকার কাঁসার বাঁক মল ছাড়া, ইহারা অপর কোন অলঙ্কার ব্যবহার করে না। তবে যাহারা দুই পয়সা জমাইয়াছে, তাহাদের বাড়ীর মেয়েরা রূপার চুড়ি কখন কখন ব্যবহার করে। আর আমাদের নভেলগতপ্রাণা বাঙ্গালী মহিলাদিগের গহনার "বাণি" জোগাইতে, চাকরীগতপ্রাণ বঙ্গীয় যুবক ব্যতিব্যস্ত। অলঙ্কারের মূল্যের কথা না বলিয়া, কেবল "বাণি"র উল্লেখ করিলাম কেন? নূতন অলঙ্কারের ফরমাস না হইলেও পুরাতন অলঙ্কারগুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন ফ্যাসানে প্রায়ই গড়াইয়া দিতে হয়, আজ গোট ভাঙ্গিয়া রেট হইল, কাল আর একখানা ভাঙ্গিয়া ব্রেসলেট হইল ইত্যাদি নানা প্রকারে "বাণি" যোগাইতে গৃহস্থের ছেলের প্রাণ ওষ্ঠাগত। হাটে অনেক কাঁসার বাঁকমল বিক্রয় হইতেছে, দেখিলাম। এই মলগুলি পায়ের চেটোর উপর একেবারে আঁটিয়া থাকে। মলওয়ালাই স্ত্রীলোকদিগের পায়ে মল পরাইয়া দিতেছে। সে এক ভয়ানক দৃশ্য। দেখিলাম স্ত্রীলোকটীর পায়ের গাঁটের ৪।৫ অঙ্গুলি উপরে চামড়ার দড়ি বাঁধা হইয়াছে। আর সেই দড়ির শেষাংশ মলের ভিতর দিয়া গলাইয়া দিয়া, দড়ি টানিয়া মল পায়ে উঠান হইতেছে। বালিকা মাতাকে বাহুদ্বারা বেষ্টন করিয়া, তাঁহার বুকের ভিতর মাথা রাখিয়া দাঁড়াইয়া নীরবে রোদন করিতেছে। এইরূপ ভাবে মল পরাইতে, আধ ঘণ্টা হইতে এক ঘণ্টা সময় লাগে। হাজার কষ্ট হউক, তবুও স্ত্রীলোকে গহনা পরিতে ছাড়ে না;—বাড়ীতে অনেক সময় দেখিয়াছি যে হাতে চুড়ি উঠিতেছে না, কত তেল জল দেওয়াতেও হাতের ছাল উঠিয়া যাইতেছে, হাত ব্যাঙের মত ফুলিয়া উঠিল তবুও সেই চুড়ি ছাড়া হইবে না, কোন গতিকে মরিয়া বাঁচিয়া পরিতেই হইবে। কিন্তু এরূপ ভাবে কষ্ট স্বীকার করিয়া অলঙ্কার পরা আর কখনও দেখি নাই। আমরা স্তম্ভিত হইয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা তাহাই দেখিতে লাগিলাম। তবে ইহারা হিষ্টিরিয়া-

গ্রস্ত ননির পুত্তলি বাঙ্গালী মহিলা নহে, ইহারা পার্ব্বতীয় কোলনারী। কোলনারীগণ পুরুষ অপেক্ষা অধিক বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমী। ইহারা চাষ বাস হইতে আরম্ভ করিয়া গৃহস্থালীর সকল কার্য্য করে, কোলেরা প্রায়ই "হাড়িয়া" নামে এক প্রকার ভাতের "পচাই" খাইয়া নেশা করিয়া পড়িয়া থাকে।

মহিষ, গরু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি গৃহপালিত পশু, হাটে বিক্রয় হয়। একটা প্রকাণ্ড মাঠ জুড়িয়া পশুগুলি দাঁড়াইয়া আছে। এখানকার গরুর অবস্থা, আমাদের বাঙ্গালা দেশ অপেক্ষা শোচনীয়। শুনা যায়, ছোট-নাগপুরের গরু ও মহিষ ভাল; কিন্তু সে ছোটনাগপুর অর্থে হাজারিবাগ বুঝিতে হইবে। হাজারিবাগ অঞ্চলের কয়েকটা বেশ বলবান বলদ দেখিলাম। ৩০০৲ টাকা জোড়া হাঁকিল। এরূপ বলদ আমাদের দেশে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। গরু বাছুরের এইরূপ হাট পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি চাঁইবাসার প্রধান ব্যবসায়, তসর-গুটির ও গালার। হাটের স্থানে স্থানে স্তূপাকার তসর-গুটি দেখিলাম। গুটির জন্য এই হাট দেশপ্রসিদ্ধ। ভাগলপুর, পাটনা, বীরভূম, হাজারিবাগ, বাঁকুড়া, বৰ্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ, বিলাসপুর ও মারহাট্টা দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে বহুবিধ তন্তুবায় ও মহাজন আসিয়া চাঁইবাসার এই হাট হইতে তসর-গুটি ক্রয় করিয়া থাকে। নানা দেশের লোক আসিয়া হাজার হাজার লোকের নিকট হইতে তসর-গুটি ক্রয় করিতেছে—হাটে সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। উপরোক্ত সকল স্থলে তসর বস্ত্র প্রস্তুত হয় বটে, কিন্তু স্ব স্ব স্থানের উৎপন্ন গুটির দ্বারা তাহাদিগের বস্ত্রবয়ন ব্যবসা চলে না। এই হাট হইতে আবশ্যক মত গুটি তাহারা খরিদ করিয়া লইয়া যায়। সিংভূম অনায়াসে এতদিন যাবৎ ঐ সকল দেশের তাঁতি ও মহাজনগণকে গুটি জোগাইয়া আসিতেছে। সিংভূমে প্রচুর পরিমাণে গুটি উৎপন্ন হয়, কিন্তু বস্ত্রবয়ন ব্যবসা এখানে খুবই কম। কোল, ওরাং প্রভৃতি অসভ্য জাতিরা বহুকাল হইতে, পুরুষানুক্রমে গুটী উৎপন্ন করিয়া আসিতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজিও তাহারা গুটি হইতে সূতা তুলিতে পারে না। গুটি হইতে সূতা

বাহির করা শিক্ষা করিতে পারিলে, এতদিনে তাহারা ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের তসর-ব্যবসায়ী অপেক্ষা অধিকতর উন্নতি করিতে পারিত সন্দেহ নাই। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে গুটির আমদানী অধিক হয়, আজ কাল অপেক্ষাকৃত কম। শুনিলাম, গুটির দুর্গন্ধের দরুণ পথ চলা দায় হয়। যে সকল গুটি কাটিয়া কীট বাহির হইয়া গিয়াছে, সেই সকল গুটি, ৭।৮ টাকা দরে কাহন বিক্রীত হইতে দেখিলাম। আর বন হইতে বীজের জন্য, পোকা শুদ্ধ যে গুটি আনিয়াছে, সেগুলি পয়সা পয়সা। "সিংভূমে তসরের চাষ" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ লিখিতেছি; লেখা সমাপ্ত হইলেই প্রবন্ধটী পিতাকে পাঠাইয়া দিব। তিনি সেটী প্রকাশ করিবার উপ-যুক্ত বিবেচনা করিলে, কোন মাসিক পত্রে ছাপাইতে দিবেন, ইহাই আমার ইচ্ছা।

এখানে গালার চাষও খুব হয়। তবে কোলেরা গালা গালাইয়া পরিষ্কার করিতে জানে না; Crude, অপরিষ্কার অবস্থায় হাটে আনিয়া বিক্রয় করে। এই অপরিষ্কার গালা আজ কাল ২৭।৩০ টাকায় মণ বিক্রয় হইতেছে। চক্রধরপুরে একটী বড় গালার কারখানা আছে। তাহারা এই Crude গালাকে সংশোধিত করিয়া, গালার লম্বা লম্বা বাতি প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দেয়।

সিংভূম জেলার নানা স্থানে লোহার খনি আছে। চাঁইবাসা সহরের এক মাইল দূরে, কয়েকটী Manganese খনি বাহির হইয়াছে। খনির কোম্পানিরা বেশ দুই পয়সা লাভ করিতেছে। আজ কাল Manganese এর বড়ই দরকার। রাসায়নিক নানাবিধ পরীক্ষার জন্য, Manganese dioxide ব্যবহার করিতে হয়; আর Potassium per manganate, dis-infectant রূপে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা ভিন্ন, কাচে নানা রূপ রং করিবার জন্য Manganese খুব দরকারি। লোহা খনি ছাড়াও, বনে জঙ্গলে, নদীর ধারে, নানা স্থানে পাওয়া যায়। এই সকল ছোট ছোট লোহার "ঢেলা" কুড়াইয়া, সেইগুলি গলাইয়া, এই জেলার কামারে কোদালি ও কাস্তে প্রস্তুত করে। হাটে ঐরূপ খাঁটি স্বদেশী কোদাল ও কাস্তে বিক্রয় হইতেছে দেখিলাম।

২।৩ ঘণ্টা হাট ঘুরিয়া বেড়াইলাম। একটা জিনিসের উপর হঠাৎ নজর পড়িল। হাজার হাজার লোক জমা হইয়াছে; বর্ষাকাল সকলেরই মাথায় ছাতি আছে, কিন্তু সবগুলিই বিলাতী ষ্টিলের ছাতি। অনেক অন্বেষণ করিয়া ৪টী মাত্র দেশী পাতার তৈয়ারি ছাতা দেখিতে পাইলাম। পরণে একটু একটু কোপীন, কিন্তু মাথার উপর ১২।১৪ আনা দামের এক একটা বিদেশী ছাতা! অসভ্য কোলেরাও ষ্টিলের ছাতা ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে; তবুও তাহাদিগকে অসভ্য বলিতেছি। হাটে সকল দ্রব্য পাওয়া যাউক বা না যাউক, এমন হাট ত আর কখন দেখি নাই।

তসর-চাষ বিষয়ে প্রবন্ধ এখনও শেষ করিতে পারি নাই। আজ তোমাকে তসর-চাষ সম্বন্ধে গোটাকতক প্রধান কথা লিখিতেছি। আমার প্রবন্ধ পড়িয়া পরে এই বিষয়ে সকল কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে।

আমাদের দেশে প্রধানত তিন প্রকার রেসম তৈয়ার হইয়া থাকে;—(১) গরদ; (২) তসর; (৩) এড়ি বা এণ্ডি। গরদের ও তসরের গুটি হইতে অনায়াসে পরিষ্কার সূক্ষ্ম সূতা তোলা যায়, কিন্তু এড়ির গুটি হইতে অনায়াসে সূতা তুলিতে পারা যায় না;—সমস্ত গুটিকে তুলার মত পিঁজিয়া পরে চরকা ও টেকোর সাহায্যে সূতা কাটিতে হয়। গরদের গুটি বনে জঙ্গলে হয় না, মনুষ্যে অনেক পরিশ্রম করিয়া তাহাদিগের বাটীতে, নিজের তত্ত্বাবধানে, তুঁত ও কুল প্রভৃতি গাছে, ইহার আবাদ করে। নিজেদের সন্তান সন্ততিকে যেরূপ ভাবে যত্নের সহিত লালন পালন করিতে হয় তাহা অপেক্ষা শত গুণে অধিক যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া গরদকীটের লালন পালন করিতে হয়। পক্ষান্তরে, তসর ও এড়ির গুটি বনে জঙ্গলে নানা স্থানে জন্মায়। রেড়ী, ভেরাণ্ডা অথবা বিশুদ্ধ ভাষায় এরণ্ড গাছে গুটি জন্মায় বলিয়া, ইহাকে “এড়ি” অথবা এণ্ডি বলে। আর আসন, শাল, অর্জ্জুন প্রভৃতি পার্ব্বতীয় গাছে তসর গুটির জন্ম। কেবল যে অরণ্য মধ্যে তসরের জন্ম তাহা নহে,—খোলা মাঠের উপর, মুক্ত বায়ুতে, ঐ সকল গাছে, লোকে নিজেদের তত্ত্বাবধানে ইহাদিগের আবাদ করে।

গুটিপোকা পূর্ণযৌবন প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে, ইহাদিগের চারিটী বিভিন্ন অবস্থা অথবা ক্রম দৃষ্ট হইয়া থাকে। (১) মাতৃগর্ভ হইতে পতিত হইবার

পর ৯।১০ দিন পর্য্যন্ত ডিম্বাবস্থা। (২) ডিম ফুটিবার পর হইতে, ১ মাস হইতে ২।৩ মাস পর্য্যন্ত কীটাবস্থা। এই কীটাবস্থা প্রাপ্ত পোকাকে আমরা সচরাচর গুটিপোকা (Citerpillar) বলিয়া থাকি। এই অবস্থায় কীটগণ চারিবার দেহের উপরিভাগের ত্বক পরিত্যাগ করে। ইংরাজীতে ইহাকে moulting বলে। ইহা সাপের খোলস্ ছাড়ার মত। (৩) চারিবার খোলস্ ছাড়ার পর কীটগণ মুখ হইতে লালা বাহির করিতে করিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া স্বদেহের চতুর্দ্দিকে গুটি তৈয়ার করে, এবং সম্পূর্ণরূপ স্বকৃত গুটির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। সকল শ্রেণীর গুটিপোকার তৃতীয় অবস্থার কাল সমান নহে। ২০ দিন, ১ মাস, ২ মাস হইতে প্রায় ১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন কোন পোকা এই অবস্থায় গুটির মধ্যে আবদ্ধ থাকে। এই অবস্থায় ইহাদের চোখ মুখ প্রভৃতি সকলই লোপ পায়। তখন ইহারা গাঢ় রক্ত-বর্ণের বিকৃতাকৃতি জীবে পরিণত হয়। বদ্ধবায়ুর মধ্যে, আহারাদি পরিত্যাগ করিয়া স্থির ও ধীরভাবে কালযাপন করে বলিয়া, এই দেশের লোকের বিশ্বাস যে, ঐ অবস্থায় কীটগণ যোগাসনে বসিয়া ভগবৎচিন্তায় বিভোর;—সুতরাং তাহারা বাহ্যজ্ঞান শূন্য; যোগ করিতে করিতে শরীরের অভাবনীয় পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তবুও তাহাদিগের ভ্রূক্ষেপ নাই। এই তৃতীয় অবস্থা প্রাপ্ত কীটগণকে ইংরাজীতে Crysalids কহে। আমি আমার প্রবন্ধে এই অবস্থাকে কীটের "যোগাবস্থা" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। (৪) যোগাবসান হইলেই, নানা বর্ণে রঞ্জিত পক্ষাদি সংযুক্ত প্রজাপতির আকার ধারণ করিয়া কীট গুটির ঊর্দ্ধদেশ কাটিয়া, তথা হইতে বাহির হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় কীটকে গুটি-প্রজাপতি (moth) বলা যায়। ইহাই কীটগণের পূর্ণযৌবন কাল। কোন গুটি হইতে পুং ও কোন গুটি হইতে স্ত্রী প্রজাপতি বাহির হয়, তবে স্ত্রীপ্রজাপতির সংখ্যাই অধিক।

বন হইতে কীটসমেত-গুটি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া গৃহে রাখা হয়। পরে সেই গুটি কাটিয়া পুং প্রজাপতি বাহির হইলে, তাহার কোন যত্ন না লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া যায়। আর স্ত্রীপ্রজাপতিগুলিকে অতি সন্তর্পণে পাতার উপর বসাইয়া গৃহের সন্নিকটে কোন গাছের পাতার সহিত আটকাইয়া দেওয়া হয়। বাদুড়ে প্রজাপতি খাইতে বড় ভালবাসে, সেই

জন্য সমস্ত রাত্রি বাদুড়ের হাত হইতে ইহাদিগকে রক্ষা করিতে হয়। প্রাতে দেখা যায় সেই সকল স্ত্রীপ্রজাপতি পুরুষের সহিত মিলিত হইয়া রহিয়াছে। সেই অবস্থায় পাতায় করিয়া তাহাদিগকে গৃহে আনা হয়। বৈকালে পুং প্রজাপতি চলিয়া যাইবামাত্র, স্ত্রীগণ ডিম্ব প্রসব করিতে আরম্ভ করে। এইরূপে তিন দিন ক্রমাগত তাহারা ডিম পাড়ে। ডিমগুলির গাত্রে আঠার মত একটা চটচটে পদার্থ লাগিয়া থাকে। আস্তে আস্তে ছাইয়ের উপর ঘসিয়া, সেগুলি পরিষ্কার করিয়া, এক একটী পাতার দোনার মধ্যে, ৯০ হইতে ১০০ পর্য্যন্ত ডিম রাখিয়া দেওয়া হয়। ৯।১০ দিন পরে এই ডিম ফুটিয়া কীট বাহির হইলে, ৫।৬টী কীটপূর্ণ দোনা, এক একটী গাছের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে লাগাইয়া দেওয়া উচিত। এদেশে প্রধানতঃ শাল ও আসন গাছে গুটির চাষ করা হয়। এক গাছের সমস্ত পাতা খাইয়া ফেলিলে, কীটগুলিকে অন্য গাছে স্থানান্তরিত করা হয়। কীটাবস্থা প্রাপ্ত হইবার ৫।৬ সপ্তাহের মধ্যে, কীটগণ চতুর্ব্বার দেহের ত্বক ত্যাগ করে। ইহার পরেই, কীটগণ গুটি তৈয়ার করিতে আরম্ভ করিয়া, ক্রমে স্বকৃত গুটির মধ্যে সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ হয়। ২।৩ দিনের মধ্যে গুটি শক্ত হইয়া, গুটির মধ্যে পোকা কীটাবস্থা হইতে যোগাবস্থায় পরিণত হয়। এই সময়, ছোট ছোট ডালশুদ্ধ ভাঙ্গিয়া, গুটিগুলিকে গৃহে আনয়ন করা হয়। কোন কোন শ্রেণীর গুটি হইতে, বৎসরের মধ্যে ২।৩ বার প্রজাপতি বাহির হয়! গুটি হইতে অন্য ফসল পাইবার প্রত্যাশা না করিলে, গরম বাষ্পের ভাবরায় সে গুলিকে মারিয়া ফেলা হয়। যে সকল গুটি কাটিয়া প্রজাপতি বাহির হইয়াছে, সেই সকল কাটা গুটি হইতে, মটকা, থেটে প্রভৃতি মোটা তসরের কাপড় প্রস্তুত হয়; আর যে গুটি হইতে প্রজাপতি বাহির হয় নাই, যোগাবস্থাপ্রাপ্ত কীটকে গুটির মধ্যের বাষ্পের উত্তাপে মারিয়া ফেলা হইয়াছে, তাহা হইতেই উৎকৃষ্ট তসর তৈয়ার হয়। জীবহিংসা করিয়া তসর কাপড় প্রস্তুত হয় বলিয়া জৈনগণ তসর কাপড় ব্যবহার করেন না।

ঋতুর অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন গুটি পোকার বিষম শত্রু। আব হাওয়ার কিঞ্চিৎ বৈষম্য লক্ষিত হইলেই ইহাদিগের মরণ। এই সকল দৈবদুর্ব্বিপাক

হইতে কীটগণকে রক্ষা করিবার উপায় নাই। ইহা ভিন্ন অনেক পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ সকলেই গুটিপোকার চিরশত্রু। শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য লোকে নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া, দিবারাত্র পাহারায় নিযুক্ত থাকে। নানা প্রকার সংক্রামক ও আণুবীক্ষণিক উদ্ভিজ্জ ব্যাধিও (Fungoid) ইহাদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। আজ পর্য্যন্ত এই সকল রোগের প্রায় কোন প্রতিকার আবিষ্কৃত হয় নাই। গুটি-চাষ বহু আয়াসসাধ্য এবং ফসলের ভাল মন্দ অনেক সময়েই ভগবানের উপর নির্ভর করে।

গুটি হইতে সূতা তুলিবার জন্য, ছাই ও সাজিমাটি মিশ্রিত জলে, গুটিগুলি সিদ্ধ করা হয়। অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল ক্ষারের জলে গুটি সিদ্ধ করিয়া, পরে পরিষ্কার জলে সেইগুলি ধুইয়া ফেলা উচিত। তৎপরে শুষ্ক ছাইয়ের উপর পাতলা কাপড় বিছাইয়া, তাহার উপর গুটি রাখিলে সেগুলি অল্প শুষ্কাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় গুটি হইতে সূতা তুলিতে হয়। বাম হাতে করিয়া ৪।৫টী গুটি হইতে একেবারে সূতা তুলিতে আরম্ভ করে এবং দক্ষিণ হস্তে নাটাই লইয়া সঙ্গে সঙ্গে সেই সূতা নাটাইয়ে জড়াইতে থাকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ দেশে যাহারা গুটির চাষ করিয়া থাকে, তাহারা সূতা তুলিতে জানে না। তাঁতির ঘরের স্ত্রীলোকেরাই এখানে সচরাচর গুটি হইতে সূতা তুলিয়া থাকে। সিংভূম জেলায় "কোষ্টা" অথবা তাঁতির সংখ্যা অতিশয় অল্প।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

নদীয়ায় যবনাধিকার

বক্তিয়ার খিলিজি, অধিকৃত প্রদেশ দুই ভাগে বিভক্ত করেন, এবং গৌড়ের ন্যায় দিনাজপুরের সন্নিহিত দেবকোটে আর একটী রাজধানী স্থাপন করেন। এই দেবকোটেই বক্তিয়ার কালগ্রাসে পতিত হন। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশ দিল্লীশ্বরের অধীন হয়, বাদশাহ গায়সুদ্দিন বলবন্ শাসন সৌকার্য্যার্থ বঙ্গদেশকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া গৌড়নগরীকে উত্তর ভাগের, সুবর্ণগ্রামকে পূর্ব্ব ভাগের এবং নবদ্বীপের পরিবর্ত্তে সরস্বতী-তীরস্থ সপ্তগ্রামকে পশ্চিম ভাগের রাজধানী মনোনীত করেন *। সপ্তগ্রাম তখন বাণিজ্যাদির কেন্দ্রস্থলরূপে গণ্য হয় এবং বহুসংখ্যক ধনবান্ বণিক এখানে আসিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। কালে এই সমৃদ্ধিশালী সপ্তগ্রাম বিজন অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। ধনীর অভ্রভেদী প্রাসাদ ও দরিদ্রের পর্ণকুটীর একই দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। যে দিন বিশাল-কায়া বেগবতী পুণ্যসলিলা সরস্বতীর স্রোত মন্দীভূত হইতে আরম্ভ হইয়া-ছিল সেই দিন হইতে, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সপ্তগ্রামের প্রাচীন সমৃদ্ধি হ্রাস পাইতে আরম্ভ হয়।

১৩৮৬ খৃষ্টাব্দে সামসুদ্দিন ইলিয়স্ সমগ্র বঙ্গদেশের একছত্র রাজা হন এবং দিল্লীশ্বরের অধীনতা অস্বীকার করেন। সামসুদ্দিন গৌড় পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডুয়ায় রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র সুবিখ্যাত সেরসাহ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। কিন্তু তিনি

---

* In the early period of the Mahometan rule Satgaon was the seat of the Governors of Lower Bengal and a mint town. It was also a place of great commercial importance.

Encyclopedia Brittanica. 9th Edition Vol. XII Page 148.

তাঁহার কৃতঘ্ন পুত্র গীয়াসুদ্দিন কর্ত্তৃক নিহত হইলে, ভাতুড়িয়ার জমিদার রাজা গণেশ বা কংসনারায়ণ বাইজিদ্‌সাহ নামে একজনকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন, পরে ১৪০৪ খৃষ্টাব্দে স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দশ বৎসর নির্ব্বিবাদে রাজ্য ভোগ করেন। গণেশের পুত্র জাঠমল বা যদু জালালুদ্দিন নাম ধারণ পূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া ১৪১৪ হইতে ১৪৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। অনন্তর জালালুদ্দিনের পুত্র আহমদ্‌সাহ সিংহাসন লাভ করেন। কিন্তু তিনি অচিরে তাঁহার ভৃত্যবর্গ কর্ত্তৃক নিহত হইলে নসিরুদ্দিন মহম্মদ সাহ সিংহাসন অধিকার করেন। ইঁহার পুত্র বারবাক্ সাহ নিজ সেনাদলে আট হাজার হাব্‌সী ক্রীতদাসকে স্থান দান করেন। তাহারা ক্রমশঃ প্রভূত শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং অন্তঃপুর রক্ষী খোজা ও পাইক সৈন্যগণের সহিত মিলিত হইয়া, ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গাধিপতি ফতে সাহকে হত্যাপূর্ব্বক বারীক নামক খোজাকে সুলতান সাজাদা নামে বাঙ্গালার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। বাঙ্গালার সিংহাসনে এইরূপে এক নপুংসক সমারূঢ় হইল। কিন্তু তাহাকে অধিক দিন রাজ্যভোগ করিতে হয় নাই। হাব্‌সী সেনাপতি মালিকিদ্দিন ইহাকে নিহত করিয়া ফিরোজ সাহ নামে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহার পর নসিরুদ্দিন মহম্মদসাহ রাজা হন। তিনিও আবার সিদ্দিবদর দেওয়ানে নামক এক ব্যক্তির দ্বারা নিহত হন। এই সিদ্দিবদর মজাফর সাহ নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। তাঁহার ন্যায় নৃশংস ও যথেচ্ছাচারী রাজা অতি অল্পই পরিদৃষ্ট হয়। তিনি নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিবার মানসে প্রথমে তুর্কী জাতীয় ওমরাহগণের নিধন সাধন করেন, পশ্চাৎ হিন্দু সামন্ত রাজা ও জমিদারগণকে নিহত ও বিধ্বস্ত করেন। এই নির্ম্মম নরপতির অত্যাচার হইতে কাহারও নিস্তার ছিল না। তিনি ভয়ঙ্কর হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন। এই সময়ে কতকগুলি মুসলমান তাঁহার নিকট নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদিগের নামে নানারূপ মিথ্যাপবাদ দিয়া নবদ্বীপ ধ্বংসের অনুমতি গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাতে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণগণের উপর যৎপরোনাস্তি অত্যাচার হয়। তাহা-দের অত্যাচার নবদ্বীপের সন্নিহিত পিরল্যা গ্রামেই অতিশয় ভীষণ আকার ধারণ করে। তাহারা পিরল্যাবাসী ব্রাহ্মণগণকে বলপূর্ব্বক তাহাদের উচ্ছিষ্ট

অভক্ষ্য দ্রব্যাদি ভক্ষণ করাইয়া জাতি ধর্ম্ম নাশ করিয়াছিল। এইরূপে নষ্টধর্ম্ম পিরল্যাবাসী ব্রাহ্মণগণ উত্তরকালে পিরালী নামে অভিহিত হন *।

---

* "আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয়।
ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতি প্রাণ লয়॥
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কাঁধে।
ঘর দ্বার লোটে তার নাগপাশে বাঁধে॥
দেউল দেহারা ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী।
প্রাণভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপ বাসী॥
গঙ্গাস্নান বিরোধিল হাট ঘাট যত।
অশ্বত্থ পনস বৃক্ষ কাটে শত শত॥
পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন।
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে।
বিষম পিরল্যা গ্রাম নবদ্বীপের কাছে॥
গৌড়েশ্বর বিদ্যমানে দিল মিথ্যা বাদ।
নবদ্বীপ বিপ্র তোমার করিবে প্রমাদ॥
গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হবে হেন আছে।
নিশ্চিন্ত না থাকিও প্রমাদ হবে পাছে॥
নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ অবশ্য হবে রাজা।
গন্ধর্বে লিখন আছে ধনুর্ময় প্রজা॥
এই মিথ্যাকথা রাজার মনেতে থাকিল।
নদীয়া উচ্ছন্ন কর রাজা আজ্ঞা দিল"॥

পূর্ব্বোক্ত বিবরণটী শ্রীচৈতন্য দেবের প্রিয় ভক্ত সুবুদ্ধি মিশ্রের ভাগ্যবান পুত্র শ্রীচৈতন্যের কৃপা পাত্র জয়ানন্দ তাঁহার চৈতন্যমঙ্গলে বিবৃত করিয়াছেন। জয়ানন্দ এই ঘটনার প্রায় সমসাময়িক ব্যক্তি, সুতরাং তিনি যাহা দেখিয়াছেন তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এরূপ স্থলে তাঁহার কথায় অবিশ্বাসের কোনও কারণ নাই। এই উৎপীড়িত পিরল্যাগ্রামবাসীগণের "পিরালী" নামকরণ সম্বন্ধে দুই মত দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন এই পিরল্যাবাসী নষ্টধর্ম্মী ব্যক্তিগণই পিরালী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; যেমন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের মধ্যে বিশেষ বিশেষ গ্রাম বা ব্যক্তির নাম হইতে সমাজ মধ্যে বিভিন্ন থাকের উৎপত্তি তেমনি পিরল্যা হইতে "পিরালী" থাকের উৎপত্তি হয়। আবার কেহ বলেন, বাগের হাটের পীর আলি সাহেব হইতে পিরালীর উৎপত্তি, এবং বাগের হাটে পীরআলি সাহেবের যে কবর

অনিচ্ছায় বল প্রয়োগে জাতিচ্যুত হইলে অনেকে যবনাচার গ্রহণ করিয়াছিলেন, আবার অনেকে করেন নাই *।

পিরালীগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে বহু প্রবাদ প্রচলিত আছে। কথিত আছে পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে † খাঁ জাহান আলি বা খাঞ্জেআলি নামে কোন এক ধনশালী মুসলমান দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে সুন্দরবন আবাদের সনন্দ লইয়া যশোহরে আসিয়া উপস্থিত হন। এই সুজলা সুফলা উর্ব্বরা ভূমিতে বিস্তীর্ণভাবে আবাদ করিয়া খাঞ্জেআলি অল্পকালের মধ্যে বিপুল ধনের অধিকারী হইয়া উঠেন এবং নবাব খাঞ্জেআলি নামে খ্যাত হন। নবাব খাঞ্জেআলির সুবিস্তীর্ণ জমিদারীর শাসনভার যশোহরের বেঙুটিয়া পরগণার জমিদার কামদেব ও জয়দেব রায় চৌধুরী ভ্রাতৃদ্বয়ের উপর অর্পিত ছিল। এই দুই ভ্রাতা নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তাঁহাদের যত্নে এবং নবাব খাঞ্জে আলির অর্থে খুলনা বাগেরহাট প্রভৃতি অঞ্চলে অনেকগুলি প্রশস্ত রাজবর্ত্ম প্রস্তুত ও পুষ্করিণী খনন করা হয় ‡।

এই সময়ে জনৈক ব্রাহ্মণ সন্তান মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া মহম্মদ তাহের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক নবাব খাঞ্জে আলির সহিত মিলিত হন। মহম্মদ তাহের স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একজন গোড়া মুসলমান হইয়া উঠেন এবং নবাব খাঞ্জে আলির সাহায্যে তৎপ্রদেশস্থ হিন্দুগণকে মুসলমান করিতে প্রবৃত্ত হন ও তিন শত ষাটটী মস্‌জিদ্ স্থাপন করেন, এ কারণে

অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে উহাতে পীর-আলির মৃত্যু তারিখ ১৪৩৯ খৃষ্টাব্দ বলিয়া লিখিত আছে, অতএব পীরালীর সৃষ্টি জয়ানন্দ বর্ণিত ঘটনার কিছু দিন পূর্ব্বে, সম্ভবতঃ ঐ নষ্টধর্ম্মী পিরালীগণের মধ্যে বহু লোক আসিয়া নবদ্বীপের পল্লীবিশেষে বাস করায় উহাই পীরল্যা গ্রাম নামে অভিহিত হয় এবং উক্ত ব্যক্তিগণ কর্তৃক উত্তেজিত হইয়া গৌড়েশ্বর নবদ্বীপ ধ্বংসের অনুমতি প্রদান করেন।

* ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ৪ আইনের ৭ ধারা দৃষ্টে জানা যায় ম্লেচ্ছাচারী পিরালীগণের শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকার ছিল না। পরে ১৮১০ খৃষ্টাব্দে নিষিদ্ধ জাতির তালিকা হইতে পিরালী নাম তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

† জয়ানন্দ বর্ণিত পিরালী বিপ্লবের প্রায় সমসাময়িক।

‡ Vide Hunter's Statistical Account of Jessore.

তৎপ্রদেশস্থ মুসলমানগণ তাঁহাকে "পির আলি" নামে অভিহিত করিয়া সম্মানিত করেন। পিরআলি আপনার বুদ্ধিকৌশলে ক্রমে ক্রমে নবাব খাঞ্জে আলির অতিশয় প্রিয়পাত্র হন এবং পরিশেষে তাঁহার উজিরী পদ লাভ করেন। দরিদ্র তাহের উজিরী পদ প্রাপ্ত হইলেও তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইল না, তিনি দেখিলেন তদঞ্চলে কামদেব ও জয়দেব রায়চৌধুরী ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতিপত্তি অসাধারণ; একে তাঁহারা স্বয়ং বহু অর্থের অধীশ্বর তাহাতে আবার নবাব খাঞ্জে আলির সুবিস্তীর্ণ জমিদারীর শাসনভার হস্তে থাকায়, তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে সে অঞ্চলের রাজা; সুতরাং উজিরী পাইলেও তাঁহাকে এই দুই ভ্রাতাকে মান্য করিয়া চলিতে হইবে; বিশেষতঃ তাঁহারা নিষ্ঠাবান কুলীন ব্রাহ্মণ, আর তিনি ব্রাহ্মণ হইয়াও স্বধর্ম্মত্যাগী মুসলমান বলিয়া অনেকের চক্ষে অতি হীন। এই সকল কারণে পিরআলি, চৌধুরী ভ্রাতৃদ্বয়ের পরম বিদ্বেষী হইয়া উঠেন এবং কিসে তাঁহাদের অনিষ্ট করিবেন তাহার সুযোগ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে কোন একটী ঘটনা উপলক্ষে পিরআলি তাঁহাদের সর্ব্বনাশ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। নবাব খাঞ্জে আলি সকল সময়ে দরবারে উপস্থিত থাকিতেন না। এক্ষণে উজির হওয়ায় পিরআলিই অধিকাংশ সময় দরবারে উপস্থিত থাকিতেন। কামদেব ও জয়দেব রায়চৌধুরীও কার্য্যোপলক্ষে সময়ে সময়ে দরবারে আসিতেন। এক দিন রোজার উপবাসকালের মধ্যে দরবার হইতেছে, এমন সময়ে জনৈক কর্ম্মচারী একটী ঘৃতকলম্বা লেবু আনিয়া উজিরকে উপহার দিলেন। পিরআলি লেবুটীর আঘ্রাণ লইয়া সবিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। সেই দরবার গৃহে নিষ্ঠাবান হিন্দু চৌধুরী ভ্রাতৃদ্বয় উপস্থিত ছিলেন, জ্যেষ্ঠ কামদেব রায়চৌধুরী উপবাসকাল মধ্যে উজির সাহেবকে লেবুর আঘ্রাণ লইতে দেখিয়া বলিলেন—"হুজুর করিলেন কি, রোজার দিন লেবুর আঘ্রাণ লইলেন?"। উজির জিজ্ঞাসা করিলেন—"দোষ কি?" তাহাতে কামদেব উত্তর করিলেন, "আমাদের শাস্ত্রে উক্ত আছে উপবাসের দিন কোন দ্রব্যের ঘ্রাণ পর্য্যন্ত লইতে নাই, কারণ ঘ্রাণে অর্দ্ধেক ভোজন হয়।" পির-আলি একথা শুনিয়া মনে করিলেন তিনি যে পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহাই লক্ষ্য

করিয়া কামদেব তাঁহাকে এবম্বিধ বিদ্রূপ করিতে সাহসী হইয়াছেন। তিনি মনে মনে ইহার প্রতিশোধ লইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

প্রতিহিংসা-পরায়ণ উজির এক দিন প্রজাসাধারণ ও কর্ম্মচারীবৃন্দের এক দরবার আহ্বান করিলেন এবং চৌধুরীবংশের সকলকে বিশেষ করিয়া নিমন্ত্রণ করিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিবসে যথাসময়ে সকলে দরবারে উপস্থিত হইলে পূর্ব্বনির্দ্দেশানুসারে ঐ দরবার প্রাঙ্গণের সন্নিকটে এক সুপ্রশস্ত গৃহে মুসলমান বাবুর্চ্চিগণ নানাবিধ সুগন্ধি মসলা পলাণ্ডু ও লশুনাদি সংযোগে গোমাংস রন্ধন করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সভাগৃহ গন্ধে ভরপুর হইয়া উঠিল। সভাস্থ হিন্দুগণ নাসিকায় বস্ত্র দিয়া বসিলেন; পিরআলি মনে মনে সবিশেষ আহ্লাদিত হইয়া মৌখিক সৌজন্য সহকারে বলিলেন, "চৌধুরী মহাশয়গণ ওরূপ নাসিকা আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছেন কেন? ব্যাপার কি?" কামদেব উত্তর করিলেন "মাংসের গন্ধ"। তখন নষ্টবুদ্ধি পিরআলি বলিলেন "অগ্রে গোমাংসের গন্ধ পাইয়া পরে নাসিকা আচ্ছাদন করিয়াছেন, তাহা হইলে হিন্দুশাস্ত্র মতে আপনাদের সকলেরই ঘ্রাণে অর্দ্ধ ভোজন হইয়া গিয়াছে, সুতরাং আপনাদের সকলেরই জাতিচ্যুতি ঘটিয়াছে, এক্ষণে আর নাসিকাচ্ছাদনে ফল কি?" পিরআলির এবম্বিধ বাক্যে কামদেব প্রমাদ গণিলেন। ওদিকে উজিরের আদেশে কয়েকজন সিপাহী আসিয়া বলপূর্ব্বক কামদেব ও জয়দেবের মুখে গোমাংস প্রদান করিল। গ্রামস্থ হিন্দুগণ সকলে মিলিয়া রায়চৌধুরী বংশীয়গণকে ও অন্যান্য দরবারে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে পতিত সিদ্ধান্ত করিলেন এবং তাঁহাদের সহিত আহার ব্যবহার রহিত করিলেন। এ দিকে কামদেব ও জয়দেবের মুখে প্রত্যক্ষভাবে গোমাংস পতিত হওয়ায় তাঁহাদের জ্ঞাতিবর্গ ও নিকট কুটুম্বগণও তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন, তখন সেই দুই দুর্ভাগ্য ব্রাহ্মণ সন্তান মুসলমান হওয়া ব্যতিত গত্যন্তর নাই দেখিয়া নবাব খাঞ্জেআলি খাঁর শরণাপন্ন হইলেন ও যথাক্রমে কামালউদ্দীন খাঁ চৌধুরী ও জামালুদ্দীন খাঁ চৌধুরী নাম লইয়া যশোহরের পাঁচ ক্রোশ দূরে সিংহিয়া গ্রাম জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাস করিলেন; ইহাদের বংশাবলী বৃদ্ধি পাইয়া এখন

সাতক্ষীরা, হুসেনপুর, মাগুরা, বসুলিয়া প্রভৃতি গ্রামে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।

পীরআলির দৌরাত্ম্যে এই সকল ব্যক্তির জাতিচ্যুতি ঘটায় তাঁহাদের পতিত বংশাবলী সাধারণতঃ পিরালী নামে খ্যাত হন। রায় চৌধুরী বংশীয়গণ এইরূপে গুড়গ্রামী সাধ্য শ্রোত্রীয় হইতে পিরালী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া পুত্র কন্যার বিবাহ দিতে বিশেষ দায়ে পড়িতে লাগিলেন। তাঁহাদের ধনের অপ্রতুল ছিল না, সুতরাং ধনবলে কুলীন ও শ্রোত্রীয় পাত্র সংগ্রহ করিয়া বিবাহাদি সম্পন্ন করিতে লাগিলেন, তখন সেই সকল কুটুম্বগণও পতিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে পিরালীগণের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

এতদ্ব্যতীত পিরালীগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে আরও অনেক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। এ সকল কিম্বদন্তীর মধ্যে কতটুকু ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে তাহা নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন, সুতরাং জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গল, যাহা ইতিহাসবহুল প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া সাহিত্যে আদৃত তথা কথিত বিবরণটী, এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়।

নবদ্বীপবাসীগণের উপর অত্যাচার অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। পিশাচ প্রকৃতি মজাফরের প্রধান মন্ত্রী সৈয়দ হুসেন সাহ মুসলমান ও হিন্দু জমিদারগণের সহিত মিলিত হইয়া ১৪৯৬ অব্দে মজাফরের কলুষময় জীবনের অবসান করত স্বয়ং বঙ্গসিংহাসন অধিকার করেন। হুসেন সাহ নবদ্বীপের নষ্ট মন্দির ও ভগ্ন দেউল প্রভৃতির পুনঃসংস্কারের অনুমতি প্রদান করেন। এই হুসেন সাহ পুর্ব্বে সুবুদ্ধি খাঁ নামক এক জন ধনাঢ্য কায়স্থের বাটীতে ভৃত্যের কার্য্য করিতেন। কোন সময়ে সুবুদ্ধি খাঁ তাঁহাকে পুষ্করিণী খনন কার্য্যের পরিদর্শক নিযুক্ত করেন। কিন্তু হুসেন তাঁহার প্রভুর নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে সবিশেষ মনোযোগী না হওয়ায়, সুবুদ্ধি বেত্রাঘাতে তাঁহাকে জর্জ্জরিত করেন। হুসেন নীরবে বেত্রাঘাত সহ্য করেন এবং পূর্ব্ববৎ প্রভুর কার্য্য করিতে থাকেন, এ কারণ সুবুদ্ধির অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। সুবুদ্ধির চেষ্টায় হুসেন রাজসরকারে প্রথমে একটী সামান্য কর্ম্মে নিযুক্ত হন, উত্তরকালে স্বীয় সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রভাবে রাজসিংহাসন পর্য্যন্ত লাভ করেন।

হুসেন সাহের সময়ে কামরূপ বিজিত হয় এবং চট্টগ্রামে মগগণ পরাজিত হয়। তিনিই মেদিনীপুর অঞ্চলে হাব্‌সীদিগকে নিষ্কর ভূমি দান করিয়া উড়িষ্যার রাজাদিগের আক্রমণ হইতে বঙ্গদেশ রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহার সময়ে প্রজাসাধারণের অবস্থা অতি সচ্ছল ছিল। ধনীগণ স্বর্ণপাত্র ব্যবহার করিতেন। নিমন্ত্রণ সভায় যিনি যত সুবর্ণপাত্র দেখাইতে পারিতেন তিনি তত মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইতেন।

তিনি একদিকে যেমন সুশাসক বলিয়া পরিচিত, তেমনি বঙ্গসাহিত্যের উৎসাহদাতা বলিয়াও সুবিখ্যাত। ইহারই আদেশে সুপ্রসিদ্ধ কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারত অনুবাদ করেন, ইহা পারগলী ভারত বলিয়াও খ্যাত। বঙ্গকবি গুণরাজ খাঁ, ছুটী খাঁ, গোপীনাথ বসু প্রভৃতি ইঁহার সভার উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন।

হুসেনের সময় অনেক হিন্দু উচ্চ রাজকর্ম্ম প্রাপ্ত হন। সুপ্রসিদ্ধ রূপ ও সনাতন ভ্রাতৃদ্বয় দবীর খাস ও সাকর মল্লিক নামে তাঁহার সভায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন সপ্তগ্রামের রাজপ্রতিনিধি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই দুই ভ্রাতা নবদ্বীপস্থ ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর অর্থ ও ভূমি দান করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন *। চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য ভাগবত প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থে ও বহু সমসাময়িক সাহিত্যে দেখা যায় যে সে সময়ে কয়েকজন কাজী বিভিন্ন স্থানে থাকিয়া নদীয়া শাসন করিতেন। চাঁদ খাঁ নামক একজন কাজী নবদ্বীপের একাংশে বেলপুখুরিয়ায় বাস করিতেন। আর একজন শান্তিপুরের গঙ্গাতীরে থাকিতেন; তাঁহার নাম ছিল মুলুক; ইঁহার গোরাই নামে এক জন হিন্দুবিদ্বেষী পরম অত্যাচারী অমাত্য ছিল। কাজীগণ বিদ্বেষ বশতঃ সর্ব্বদাই হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতেন। ভক্ত-

* হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দুই সহোদর।
সপ্তগ্রামে বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর॥
মহৈশ্বর্য্য যুক্ত দোঁহে বদান্য ব্রাহ্মণ্য।
সদাচার সৎকুল ধার্ম্মিক অগ্রগণ্য॥
নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্য প্রায়।
অর্থ, ভূমি গ্রাম দিয়া করেন সহায়॥ চৈতন্যচরিতামৃত।

শিরোমণি যবন হরিদাস * ইসলাম ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করায় শান্তিপুর নিবাসী কাজীর প্ররোচনায় ও বাদসাহের বিচারে বেত্রাঘাতে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। কথিত আছে হরিদাস ভক্তবৎসল মহাপ্রভুর অপার কৃপায় পুনর্জীবন লাভ করিয়াছিলেন। নবদ্বীপস্থ চাঁদ কাজী মহাপ্রভুর বিরুদ্ধাচারী হইয়াও পরিশেষে তাঁহার কৃপালাভ করিতে সমর্থ হন।

শ্রীকুমুদনাথ মল্লিক।

---

* ভক্ত শিরোমণি হরিদাস ঠাকুর বনগ্রাম মহকুমার অধীন বুঢ়ণ গ্রামে মুসলমান কুলে জন্ম গ্রহণ করেন, প্রথমে তিনি বনগ্রামের অন্তর্গত বেনা-পোলের বনাভ্যন্তরে নিভৃত কুটীরে নাম যজ্ঞ আরম্ভ করেন। কিন্তু ঐ স্থানের জমীদার রামচন্দ্র খানের পীড়নে তিনি উক্ত আশ্রম ত্যাগ করিয়া প্রথমে শান্তিপুরে, পরে সপ্তগ্রামের সন্নিকটস্থ চাঁদপুর গ্রামে আসিয়া কিছু দিন বাস করেন, পরে তথা হইতে আসিয়া শান্তিপুরের সন্নিকটে ফুলিয়া গ্রামে গঙ্গাতীরে এক গুহা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। এই সময়ে তাঁহার প্রতি শান্তিপুরের কাজীর বিদ্বেষ জন্মে। ফুলিয়া গ্রামে হরিদাসের গুহার কোনও চিহ্ন ছিল না। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে যশোহর জেলার চাঁচুড়ি পুড়ুরী গ্রামের জগদানন্দ গোস্বামী বহু কষ্টে ও অনুসন্ধানে হরিদাসের আশ্রম ও ভজন গুহাটী আবিষ্কার করিয়াছিলেন ও গুহাটীকে কূপাকারে সংরক্ষণ করিয়াছেন। বর্ত্তমানকালে আশ্রমের তলে গঙ্গা না থাকিলেও গঙ্গার গভীর খাত বিদ্যমান আছে। ইহার উপর কবি কৃত্তিবাসের বাস্তভিটা।

সুভদ্রা।

শুভক্ষণে জন্ম তব, সুভদ্রা সুন্দরী!
শুভক্ষণে অভ্যুদয় হয়েছিল তব,
পুণ্যের পতন আর ধরমের গ্লানি
ঘটেছিল যবে এই আর্য্যাবর্ত্ত ভূমে
বিগত দ্বাপর যুগে। ভদ্রা, বীরাঙ্গনা,
বীর সুতা, বীরপত্নী, বীরমাতা দেবী!
করেছিলে সুপবিত্র কুলত্রয় তব
পুণ্য আচরণে, সদা পুণ্য কর্ম্ম বলে।
পুণ্যক্ষেত্র হয়েছিল এ ভারত ভূমি
তব পুণ্যসমাগমে—তব ধর্ম্মবলে।
ভারতললনা লভেছিল সুপ্রতিষ্ঠা
জগৎসমক্ষে ধরি' আদর্শ তোমার—
উচ্চশিক্ষা দীক্ষা তব করিয়ে গ্রহণ।
ধর্ম্মপ্রাণা, কীর্ত্তি তব দীপ্ত রবিসম
করেছিল উদ্ভাসিত দিগদিগন্তর।
কৃষ্ণভগ্নি, কৃষ্ণশিষ্যা সর্ব্বগুণযুক্তা
উচ্চপ্রাণা এ সংসারে কোথা তব তুলা?
বয়সে বালিকামাত্র যবে ছিলে তুমি
বীরশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয়ে হেরি', হেরি' তাঁর
বীর আচরণ, শুনি' লোকমুখে তাঁর
অসামান্য বীরত্বের মহত্বের গাথা,
বীরসেবা বীর পূজা করিয়ে মনন
স্বেচ্ছায় করিয়াছিলে তাঁরে আত্মদান
বলদেব অভিপ্রায় বিরুদ্ধে তখন।
যাদবীয় চমূসনে এই হেতু পরে
বাধিলে সংগ্রাম 'নিজে বন্দমূল' জানি'

স্বেচ্ছায় সারথ্যভার লয়ে নিজ করে
মথিয়া যাদবগণে নির্ভীক হৃদয়ে
অর্জ্জুনের রথখানি চালাইলে তুমি
অপূর্ব্ব কৌশলে কোটী ইরম্মদ তেজে।
রণ অবসানে শেষে শ্রদ্ধা ভক্তি ভরে
একেশ্বর রথী বিজয়ী বিজয় গলে
যত্নে পরাইয়াছিলে বিজয় মালিকা।
বলভদ্র আদি তবে যদুশ্রেষ্ঠ সবে
হেরেছিল বীরবালা কি সাধিতে পারে!
অতঃপর কৃষ্ণবৈরী দণ্ডীরাজ যবে
দেবাসুর নর যক্ষরক্ষঃ সবাকার
সাহায্য মাগিয়া শেষে ব্যর্থমনোরথ
তোমার শরণাগত হয়েছিল আসি'
বীরপত্নি! বীরবাক্যে আশান্বিত করি'
তুমিই রাখিয়াছিলে আশ্রিতের মান।
'আত্মহত্যা মহাপাপ' বুঝায়ে দণ্ডীরে
তুমিই বাঁচায়েছিলে তাহার পরাণ।
ক্ষত্রধর্ম্ম, ন্যায়ধর্ম্ম রক্ষিতে সংসারে
স্বামী ধনঞ্জয়ে আর ভ্রাতৃবর্গে তাঁর
কৃষ্ণ কৃষ্ণসহকারী বিপক্ষে সবার
রণমদে উত্তেজিত করিয়া ধরায়
অতুল পাণ্ডবকীর্ত্তি করিলে স্থাপন।
আর একবার যবে কুরুক্ষেত্র মাঝে
কুরুরণে নিগৃহীত হইল পাণ্ডব
ভঙ্গ দিল চারি দিকে পাণ্ডু অনীকিনী
নিজহস্তে রণসাজে সাজায়ে কুমারে
তুমিই বলিয়াছিলে "যাও পুত্র রণে,
যাও অভিমন্যু মোর, অরাতির শির

কাটি' রাশি রাশি, রক্তে তাহাদের কর
কুলের তর্পণ; মৃত্যুরে না ডর বৎস;
এ সংসার মায়াময়; অনিত্য এ দেহ;
কীর্ত্তিমাত্র মানবের অমর ভুবনে;
পৃষ্ঠ নাহি দেহ রণে; অস্ত্রলেখা যদি
ধরিতে হইবে, ধরিও নির্ভয়ে বক্ষে;
সম্মুখ সমরে মৃত্যু বাঞ্ছনীয় সদা
ক্ষত্রিয় বীরের; সম্মুখ সমরে মৃত্যু
স্বর্গের সোপান; 'অর্জ্জুনি অর্জ্জুনসম
বীরশ্রেষ্ঠ' সবে দেহ পরিচয় তার;
লহ মাতৃ আশীর্ব্বাদ—অন্ত আশীর্ব্বাদ
নাহি জানি আমি—মৃত্যু কিম্বা রণজয়,
হোক্ ভাগ্যে তোর—সমশ্রেয়ঃ লাভ দোঁহে"।
হায়! দেবি, কোথা তুমি; আজ একবার
এস এই ভারতের অবনতি-দিনে,
মাতা, পত্নী, কন্যারূপে হওগো উদয়;
প্রতি গৃহে এনে দাও নবীন জীবন
নবীন শকতি, আশা, নবীন উদ্যম;
দেশহিত মন্ত্রে পুনঃ করগো দীক্ষিত
ভারতের নর নারী সবার হৃদয়।

শ্রীচুনীলাল সেন।

দ্বারকার পথে।

(২)

তখন টিকিট কিনিবার তাড়াতাড়ি পড়িয়া গেল। দুজনে একত্রে থাকিবার জন্য আর মিটার গেজের সেকাণ্ড ক্লাসগুলা কেমন একরূপ অপরিসর ও যাত্রীর গাদাগাদি দেখিয়া ইনটারমিডিয়েট ক্লাসের অর্থাৎ মধ্য শ্রেণীর টিকিট কিনিতে গেলাম। শুনিলাম মধ্য শ্রেণীর টিকট পাওয়া যায় না। কেবল মেল ট্রেণে পাওয়া যায়। তাও সব সময়ে নয়। তখন গ্লাডষ্টোনের অহঙ্কারের কথা মনে পড়িয়া গেল। একজন গ্লাডষ্টোনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে "মহাশয়, তৃতীয় ক্লাসে ভ্রমণ করেন কেন?" গ্লাডষ্টোন ইংলণ্ডের মহা মন্ত্রী বড় কে-ও-কে-টা নয়, লোক জবাব শুনিবার জন্য ব্যগ্র এমন সময় বজ্র গম্ভীর স্বরে উত্তর হইল

"চতুর্থ ক্লাস নাই বলিয়া।"

আমিও আজ কালের গতিকে বড়লোক হইয়া পড়িলাম। এগার টাকা কয়েক আনা দিয়া পোরবন্দর পর্য্যন্ত দুই খানি টিকিট কিনিলাম। মূল্য দেখিয়া দূরত্বের আভাস পাইলাম। এ দেশের মতন সেখানে নয়। টিকিট কিনিয়াছি তবু প্লাটফরমে যাইতে দিবে না কেন না একটু বিলম্ব আছে। যাইবে যাও প্লাটফরম টিকিট ক্রয় কর। খরচ করিলে ১ খান প্লাটফরম টিকিট পাওয়া যায়। বার দুই তিন টিকিট কিনিয়া আনাগোণা করিতে বাধ্য হইলাম। মোট ঘাট ঠিক হইলে সুমুখে চাহিয়া দেখি সেই পার্সী দম্পতী। আবার সদালাপ হইল। আলাপে জানিলাম তাঁহারা ভড়োচ যাইতেছেন। তাঁহারা সওদাগর। অনেক কথাবার্ত্তার পর তাঁহারা গাড়ী আসিলে নিজ কামরায় গেলেন। আমরাও একটা কামরা "নিজ" করিয়া লইলাম। কিন্তু বড় বিপদ আমার ক্যাবিন ট্রাঙ্ক ঢুকে না—গাড়ি এত অপ্রশস্থ। বাঁকাইয়া লোক সাহায্যে তাহাকে ত ঢুকাইলাম তার পর পানীয় জল লইবার পর গাড়ি ছাড়িয়া দিল। আমি প্রতি মুহূর্ত্তে কলিকাতা হইতে দূরে যাইতে লাগিলাম।

হুস্ হুস্ করিয়া ট্রেণ ছুটিল। আমি আমার চিন্তা লইয়াই বসিয়া রহিলাম। ক্ষণকাল পরে সম্মুখে দেখিলাম এক জন বৃদ্ধ বসিয়া আছেন ও আলাপ করিবার জন্ত ব্যগ্র। কার্ড দিলেন পরিচয় পাইলাম বাটী তড়োচ— তিনি পেন্সনভোগী পুলিস ইন্স্পেক্টর। কংগ্রেসের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলাম কাগজে দেখিবেন আমাকে আর জিজ্ঞাসা করা কেন? মনে মনে বুঝিলাম তাঁহাদিগকেও সরকার ছাড়েন নাই লইয়া গিয়াছিলেন যাহা হৌক বৃদ্ধটী বড়ই সদালাপী, বলিলেন আমার বাটী চলুন সেথান হইতে বিলি ব্যবস্থা করিয়া দিব আমার ভাই আছেন অমুক স্থানে তিনিও পুলিস তিনি আপনাকে সাহায্য করিবেন ইত্যাদি। আমার পিতামহীর গল্প মনে পড়িল—যেন ডাকাতের হাতে পড়িয়াছি, কি করিয়া ছাড়াইয়া যাই। বলিলাম শত সহস্র ধন্যবাদ; কিন্তু আমার কোন সাহায্যের প্রয়োজন নাই, তবে ফিরিবার সময় যদি এই পথে ফিরি তবে মহাশয়ের বাটীতে যাইব। তখন তিনি মহা সুখী হইয়া বলিলেন, তার করিবেন আমি স্বয়ং ষ্টেসনে উপস্থিত থাকিব। ক্রমে দেখিলাম ও বুঝিলাম লোকটী বড়ই ভদ্র। পুলিসের মতই নয়।

আরও এক জন পার্সী ব্রাহ্মণের সহিত আলাপ হইল তিনি তাঁহার রেসমের পৈতা দেখাইলেন। বলিলেন অনেকের মৃগচর্ম্মের পৈতা আছে। আমার আমাদের দেশের উপনয়ন মনে পড়িয়া গেল। উপনয়নের দিনে এই সব-ই ত চাই। মনে মনে আরও বুঝিলাম যে পার্সীদের জেন্দ্—অথর্ব্ব বেদ আর কিছুই নহে। তবে কালে কালে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। পার্সীরা মৃত দেহ কেন দগ্ধ করে না জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন "অগ্নি আমাদের দেবতা তাহাতে কি করিয়া মৃত দেহ নিক্ষেপ করিব? বুঝিলাম, এ সব-ই আমার জগদম্বা মা-টীর খেলা। কেমন বুঝাইয়া রাখিয়াছেন। আর সেই অগ্নি আমাদেরও দেবতা—কেমন সচ্ছন্দে আমরা মৃত দেহ দগ্ধ করি ও করাই।

কথায় কথায় অপর ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন নামিয়া দেখি গাড়ীতে অনেক বাঙ্গালী। সুরজে নামা উঠা লইয়া ব্যস্ত ছিলাম— তখন দেখি নাই জিজ্ঞাসায় জানিলাম কেহ যাবেন বরদা দেখিতে, কেহ যাবেন ওঁকারনাথ হইয়া ই, আই, আর দিয়া রাঁচী। কেহ যাইবেন

রাজপুতানা কিন্তু কেহ বলিলেন না যে তিনি দ্বারকা যাইবেন। ভুল হইয়াছে পাবনার এক জন ডাক্তার প্রথমে বলিয়াছিলেন দ্বারকা যাইবেন। কিন্তু পরে বন্ধুবর্গের কথায় ও মন্ত্রণা ত্যাগ করিলেন। সুতরাং সেই আমি ও তিনি সেই তিনি ও আমি—দুই জনে "একলা টি"।

শুনিয়াছিলাম এই লাইন দিয়া ভাটিয়াদের দেশে যাইতে হয় আর ভাটিয়ার মত সুন্দরী রমণী আর নাই। পুলিস ও পার্সী উভয়কেই জিজ্ঞাসা করিয়া যাথার্থ্য অনুভব করিলাম। গাড়ীতেই দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম।

তার পর নর্ম্মদার বিশাল সেতু পার হইয়া ভড়োচ সহরের সম্মুখীন হইলাম। কি কারণে জানি না গাড়ী দাঁড়াইল। আর পুলিস ইন্স্পেক্টর আমাকে নানা সংবাদ জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। ভড়োচ (এক্ষণে Brooch) পূর্ব্বে বলি রাজার রাজধানী ছিল এখনও সহরের চতুর্দ্দিকের দুর্গ প্রাকার বর্ত্তমান। বলি শত অশ্বমেধ করিয়া ইন্দ্রত্ব লইতে চাহিয়াছিলেন। তিনি কাশীতে ১০টী অশ্বমেধ করেন তাই সেখানে দশাশ্বমেধ ঘাট এখনও বর্ত্তমান। ঐরূপ উজ্জয়িনী সহরে ১০টী প্রয়াগে ১০টী প্রভৃতি স্থানে স্থানে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তিনি ভড়োচ রাজধানীতেও ১০টী অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন—গাড়ী হইতে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ইন্স্পেক্টর দশাশ্বমেধ ঘাট আমাকে দেখাইলেন। এখানেও মণিকর্ণিকা আছে—সেইরূপ শব দাহ। দেখিলেই বোধ হয় সহরটী বড় পুরাতন আর কেল্লা দেখিলেই চক্ষুস্থির। এখন সহরটী বাণিজ্য-প্রধান স্থান। নর্ম্মদার এখানকার বিস্তৃতি দেখিবার মত বটে। তবে সেটা বর্ষাকালে দেখিতে হয়। এই সঙ্গে একটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না। শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় আমার মুখে ভড়োচ—বলি সংবাদ শুনিয়া বলিয়াছিলেন যে বলি যে পাতালপুরীতে ছিলেন, তাহা পাতালপুরীই বটে দেখিলে তাহাই বলিয়া মনে হয়, সহরটী মৃত্তিকায় প্রোথিত, সহরের নামটী মহাবলিপুর তাহা মান্দ্রাজের উত্তর মাদ্রাসের নিকট। অক্ষয় বাবু বলেন যে তিনি মহাবলিপুরের বিবরণ ৺ ভূদেব বাবুর নিকট শুনিয়াছিলেন। পাঠক মহাশয় মিলাইয়া দেখিবেন, সুখীও হইতে পারেন আমি কিন্তু ও চেষ্টা করিব না।

নর্ম্মদার বক্ষে এখন নানাবিধ চাষ হইয়াছে। কিন্তু দেখিলেই বোধ হয়

দেশে বড়ই জলকষ্ট। হায় রে, আমাদের মুখে আর এ কথা সাজে না। যে বাঙ্গালার লোক গ্রামে গ্রামে পুষ্করিণী খনন করিয়া সাধারণ লোক জনের উদ্দেশে দান করিয়াছিল, আজ সেই বাঙ্গালায় কেহ একটী কূপ খনন করিয়াও দেয় না—পুষ্করিণী খনন বা পঙ্কোদ্ধার করা ত বহু দূরের কথা। আজ বাঙ্গালা জলকষ্টে হাহাকার করিতেছে—আর বলিতেছে রাজা আমাদিগকে বড়ই ভাল বাসেন নহিলে এ সময় রাজবাড়ীতে নাচ-ঘর তৈয়ারি হইবে কেন? শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়।

মৃত্যুর পর।

(৪০)

কর্ম্মযোগ।

শব্দকল্পদ্রুম হইতে ভক্তির লক্ষণাদি যাহা দিয়াছি তাহা সংস্কৃত। কিন্তু সংস্কৃত হইলেও সহজ—সেই জন্য আর বাঙ্গালা অনুবাদ দিলাম না। আরও ইচ্ছা ছিল সনাতনের প্রতি গৌরাঙ্গের ভক্তি সম্বন্ধীয় উপদেশটী পাঠক মহাশয়কে উপহার প্রদান করিব। আরো একবার মনে হইয়াছিল জীব গোস্বামীর ভক্তির বিশেষণটীও উপহার দিব। তার পর মনে মনে বুঝিলাম "পুঁথী বাড়িয়া যাইবে।" আমি ত আর ভক্তি সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিতেছি না। যদি কেহ সবিস্তারে এই সকল বিষয় জানিতে চাহেন, তাহা হইলে তিনি স্বয়ং মূল গ্রন্থ পাঠ করিবেন অর্থাৎ বৈষ্ণব গ্রন্থ হইতে ঐ সকল বিষয় পাঠ করিবেন। সঙ্গে সঙ্গে শাণ্ডিল্য সূত্রও পড়িতে পারেন। "মৃত্যুর পর" অনেক দিন আরম্ভ হইয়াছে—মনে হয় ১৩০৩ সালে আরম্ভ করিয়াছি, আর আজ ১৩১৫—এক যুগ ধরিয়া একটা প্রবন্ধ আর কোন বাঙ্গালা কাগজে কখনও বাহির হয় নাই। পাঠকের ত ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছেই—বন্ধুবর্গেরও ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছে। তাঁহারা সকলে আমাকে প্রবন্ধ শেষ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন। তাঁহাদের কথা শিরোধার্য্য করিয়া কার্য্যে ব্রতী হইলাম, ভরসা করি মা জগদম্বার কৃপায় ও শ্রীশ্রীগুরুদেবের আশীর্ব্বাদে আমার আশার সাফল্য হইবে। এই বার কর্ম্মযোগের কথা।

জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগ প্রধানত এই তিনটী বিভাগ হইলেও কোন একটী প্রস্তাবিত বিষয় কোন্ বিভাগে পড়িবে সে বিষয়ে বিলক্ষণ গোলযোগ আছে। কাহারও মতে যোগটা কর্ম্মযোগের অন্তর্গত। কেন না যোগের মধ্যে ষটচক্র ভেদ রূপ ক্রিয়া আছে। হট্‌ যোগেত এক রূপ জিম্‌ন্যাস্‌টিক্‌ বা ব্যায়াম। কিন্তু রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিতেন যে যোগটা জ্ঞানযোগের অন্তর্গত। ৩৯ অধ্যায়ের প্রারম্ভে আমি জ্ঞানযোগ, কর্ম্ম-যোগ ও ভক্তিযোগ সম্বন্ধে পরমহংসদেবের মত তাঁহার অতি বিশদ ভাষায় বিবৃত করিয়াছি। পাঠক মহাশয় দেখিবেন। আমি কিন্তু বোধ সৌক-র্য্যার্থে কেবল কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে তাঁহার কথাগুলির পুনরুল্লেখ করিলাম।

কর্ম্মযোগ—জীব কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না—কর্ম্ম তাহার প্রকৃতি-গত। ইচ্ছা না করিলেও কর্ম্ম করিতে হয়। সেই জন্য অনাসক্ত ভাবে অর্থাৎ কর্ম্মের ফল আকাঙ্ক্ষা না করিয়া কর্ম্ম করিতে হয়। পূজা, হোম, জপ, তপ কর কিন্তু দেখিও যেন লোক মান্য হইবার জন্য বা পুণ্য কর্ম্ম করিবার জন্য তোমার এ কর্ম্ম না করা হয়।

কলিতে কর্ম্মযোগ ভারি কঠিন পূজা করিলাম মহোৎসব করিলাম কোথা হইতে একটু লোক মান্য হইবার ইচ্ছা এসে পড়ে। তাই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতে হয়। হে ঈশ্বর আমার কর্ম্ম কমিয়ে দাও, যে টুকু কর্ম্ম কর্‌ব যেন অনাসক্ত হয়ে কর্ত্তে পারি।

আমি চিন্তা করিতেছি, আমি ধ্যান করিতেছি ইহাও কর্ম্ম। যে একবার ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছে কেবল সেই অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম কর্‌তে পারে।

কর্ম্ম জীবনের উদ্দেশ্য নয়। মানব-জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ। কর্ম্ম একটা উপায়ও নয়। নিষ্কাম কর্ম্ম একটা উপায় বটে—কখনও উদ্দেশ্য হইতে পারে না। (বিলাত প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশবাসীরা কর্ম্মকে যে জীবনের উদ্দেশ্য মনে করে সেটা তাদের ভুল।)

প্রথমেই শ্রীমদ্ভগবদগীতায় কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে কি আছে তাহা দেখিব। শ্রীভগবান স্বয়ং এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন তাহা আলোচনা করা সঙ্গত নহে কি? শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়।

"নৈবেদ্য।"

দেবি বহুদিন হতে আছিল বাসনা,
সপুষ্প নৈবেদ্য এক সঁপি' তব পদে,
পূতমন্ত্রে করি' শেষ পূজা সমাধান,
সমাপিব জীবনের ব্রত এ ধরায়।
শুভদিন সমাগত আজ—শুভলগ্ন;
ওই শুন বাজে বাদ্য সপ্তসুরা বীণ
সমস্বরে সুগম্ভীরে এ বিশ্বমন্দিরে;
ওই শুন সুমধুর প্রতিধ্বনি তার
বাজিছে গগনপ্রান্তে বসন্ত পবনে,
যেন কহি' চরাচরে "কে কোথায় আছ
চল এস—ছুটে এস এ মাহেন্দ্রক্ষণে;
চির-আকাঙ্ক্ষিত ওই সাধনার ধন
ভুবনমোহনরূপে সম্মুখে তোমার;
আত্মনিবেদন পদে কর এই বেলা।"
ওই শুন বাজে শঙ্খ অন্তরে আমার
আকুল আহ্বানে পুনঃ আহ্বানিয়া মোর
অন্তর-আত্মারে, কহি' "বৃথা দিন যায়;
কি কর নিশ্চেষ্ট বসি' অবোধ সাধক;
সংসারের বাধা বিঘ্ন সব উপেক্ষিয়া
এই বেলা আত্মদানে তুষ্ট কর তব
ইষ্টদেবতারে; মেগে লও আশীর্ব্বাদ—
মেগে লও তোমা প্রতি চিরপ্রীতি তাঁর।"
দাঁড়াও দাঁড়াও তবে পুরোভাগে মোর,
দাঁড়াও বারেক, দেবি, আজি একবার
রাজরাজেশ্বরী-মূর্ত্তি ধরিয়া কৃপায়।

এত দিন পথপানে সতৃষ্ণনয়নে
আছিনু চাহিয়া; এল শুভতিথি আজ,
দেহ, দেবি, দেহ তবে অনুমতি মোরে,
স্নেহগঙ্গোদকপূত প্রেম অনুরাগ
-চন্দনলেপিত এই প্রাণপুষ্প সনে
দেহ ডালি নিয়োজিব তোমার পূজায়।
দীন এ নৈবেদ্য যদি, তবুও সে জেনো
আন্তরিক ভক্তিমাখা তোমারি ভক্তের,
অতএব উপেক্ষার নহে যোগ্য কভু,
ভক্তশ্রেষ্ঠ বিদুরের তণ্ডুল যেমন
হয় নাই ভক্তাধীন কৃষ্ণের উপেক্ষা।

শ্রীচুনীলাল সেন।

হিমালয় বনভূমি।

দার্জ্জিলিং।

গোড়াতেই বিড়ম্বনা দেখুন, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ই ২৫শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার আমাদের দার্জ্জিলিং যাত্রার দিন ভাল বলিয়া স্থির করিয়া দেন, কিন্তু ২৩শে আসিয়া তিনিই বলিলেন, "আমার খুড়া মহাশয় আসিয়াছেন, তিনি বলিতেছেন, যে ২৭ শে মঙ্গলবার গঙ্গাস্নানের মহা যোগ, তাহার পূর্ব্বে তুমি বাবুকে তাড়াইয়া দিতেছ কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া তুমি গঙ্গার মাহাত্ম্য ভুলিয়া যাইতেছ।" আমি কথাটা শুনিয়া একটু হাসিলাম, মনে মনে ভাবিলাম, যখন হিমালয় সন্দর্শনে যাইতেছি, তখন হিমালয়-কন্যা গঙ্গা, তাহাতে আমার উপর সন্তুষ্ট ব্যতীত কখনই রুষ্ট হইবেন না। এ পর্য্যন্ত কোন স্ত্রীলোক 'তোমার বাপের বাড়ী যাইতেছি' বলাতে আহ্লাদিত হন নাই, এমন কখন শুনি নাই, দেখি নাই— তা কি, অর্দ্ধাঙ্গিনী পত্নী, দেব-সদৃশা মাতা, আর কি পাড়া প্রতিবেশী মামী মাসী। হৌন্ না কেন গঙ্গা দেবতা—স্ত্রীলোক ত বটেন, আমি এ বয়সে এত কষ্ট করিয়া, অর্থ ব্যয়

করিয়া তাঁহার পিতৃ সন্দর্শনে যাইব, আর তিনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হইবেন,—তা কখন হইবে না, মঙ্গলবারের স্নানের পুণ্য অবশ্যই পাইব। আমার মনের খুঁৎখুতুনি চলিয়া গেল; কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে এ কথা ভাঙ্গিলাম না; তিনি অগাধ শাস্ত্রজ্ঞ হইলেও, আমার শাস্ত্র তাঁহার ত পড়া নাই।

বুড়ো যাবে হিমালয়, সঙ্গে যাবে কে ?
আরও দুটা বুড়া আছে, কোমর বেঁধেছে।

পেন্‌সন্‌প্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট জজ শ্রীযুক্ত শ্যামচাঁদ ধর, এবং কলের সাহেবদের কার্য্য হইতে অবসর প্রাপ্ত শ্রীযুক্ত কালীকুমার সেন, আমার দুই বাল্যকালের বন্ধু আমার সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত; শ্যামের দুই পুত্র আমাদের পূর্ব্বেই যাত্রা করিয়াছিলেন, এবং পৌঁছিয়া আমাদের খবরাখবর দিতেছিলেন, আমার কনিষ্ঠ পুত্র অচ্যুতচন্দ্র আমার সঙ্গেই চলিলেন; রবিবার পূর্ব্বাহ্নে আমরা পিতাপুত্রে আহারাদি করিয়া তল্‌পি তোব্‌ড়া লইয়া শ্যাম-সদনে উপস্থিত, কালীকুমারও সেই স্থানে আছেন; তবে তাঁহারা তখনও দোমনা। আমি তাঁহাদেব একমনা করিয়া দিলাম, তাঁহারা প্রস্তুত হইলেন, তাঁহারা বলেন, আমার স্ফূর্ত্তি দেখিয়াই তাঁহাদের মতি স্থির হইল। দুই প্রহরের পর আমরা কলিকাতা রওনা হইলাম। সেখানে ৩ ঘণ্টা সময় পাওয়া গেল, অচ্যুতচন্দ্র এটা ওটা ক্রয় করিয়া লইলেন; আমি কিছু জল-খাবার তৈয়ার করাইয়া লইলাম। শ্যাম বাবু কালী বাবুর সঙ্গে জলখাবার ছিল; আম আমাদের সকলেরই সঙ্গে ছিল।

রবিবার অপরাহ্ণ ৫টার সময় দার্জ্জিলিং মেলে একটী কামরায় আমরা ৪ জন আর একজন অপরিচিত লইয়া ৫ জন আরোহী, গড়্‌ গড়্‌ চলিয়াছি। নদে জেলার ভিতর দিয়া যখন যাইতেছি, তখনও পার্শ্বের ক্ষেত্রগুলি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে—ছোট ছোট পাটের চারা হইয়াছে; আউশ ধান কোথাও এক ছটাক আবাদ হয় নাই। পাটের ও ধানের তুলনা চলিল। ধান্য—লক্ষ্মী; পাট—মুদ্রা। আমরা মুদ্রা অপেক্ষা লক্ষ্মীর গৌরব গান করিতে লাগিলাম। রেলগাড়ী, আমাদের উপহাস করিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে পদ্মা অভিমুখে ছুটিল।

বিপদে পড়িয়া যে হাসিমুখে কষ্ট সহ্য করিতে পারে, অবসন্ন হয় না,—সেত মহাশয় ব্যক্তি। যে বাল্যে কিশোরে, গুরূপদেশে কষ্ট, কঠোরতা, সংযম শিক্ষা করে, সে বয়সকালে, হবে' মহাশয়; কিন্তু এই বুড়ো বয়সে, এই যে আমরা সক্ করিয়া কষ্ট ভোগ করিতেছি—আমরা কি? এই যে কয়েদীর মত কঠিন কাষ্ঠাসনে, পাঁচ জনে বসিয়া আছি—এ কষ্ট নয়ত কি? কষ্ট বটে—তা ধরি আর নাই ধরি—গায়ে মাখি, আর নাই মাখি। সক্ করিয়া এইরূপ কষ্ট সহ্য করা কেন? ইহাকে কি বলিব? পাগলামি নয় কি? পাগলামি বটে, তবে পাগলের সংখ্যা বেশী হইলে, পাগলামির নাম বদল হয়। দেবতার পাগলামী—লীলা; বালকের পাগলামি—খেলা। মানুষ মারায় হয়—বাহাদুরি। প্রজা-পীড়নে হয়—জমিন্দারী; ব্যবসাদারিতে হয় রাজগিরি। বক্তৃতায় হয়—দেশোদ্ধার, বাজি ফুটায়ে রাজ্যোদ্ধার। ধনীর পাগলামি—উদারতা, মধ্যবিত্তের পাগলামি—লৌকিকতা। বিজ্ঞের পাগলামি—জাতীয় সমিতি; অজ্ঞের পাগলামি—বিজাতীয় অনুকরণ। আমাদের মত পাগল বিস্তর—কাজেই আমাদের পাগলামির নাম—স্বাস্থ্য-সন্ধান। রেলগাড়ীর হেচ্কা টানে হাড়চূর্ণ হইতে লাগিল—আমরা স্বাস্থ্য সন্ধানে চলিয়াছি।—সে বেশ।

রাত্রি ৯টার সময় ঝক্ঝকে ইলেক্‌ট্রিক আলোতে, ষ্টীমারের উপর ডেকের ধূলার উপর চাপড়ুলি খাইয়া বসিয়া আমরা—বেশ ধীরে সুস্থে পদ্মা পার হইতেছি। তরঙ্গ-ভঙ্গ নাই—ষ্টীমারের ঝাকানি নাই, পদ্মার গর্জন নাই, কোন বালাই নাই—টাইম্‌টেবেলে লেখা না থাকিলে, কিসে বুঝিতাম যে পদ্মা পার হইতেছি। কিন্তু বাস্তবিক আমরা পদ্মা পার হইলাম; অথচ পদ্মা দেখিতে পাই নাই।

পদ্মা পারে ছোট গাড়ী। বড় ভয়, বড় ভীড় হইবে। তাহা কিন্তু হইল না। আমরা ৪ জন একরূপ গুছাইয়া লইলাম। কিন্তু এইখানে একবার গাওনা বন্ধ হইয়া সঙের পালা আরম্ভ হইল। বঙ্কে এক বর্ষীয়ান বাবুর কি একটা জামা ঝোলান ছিল, কালী বাবু তাই সরাইতে গিয়া বলিয়াছিলেন "এটা কি তোমার জামা?" আর যাবি কোথা? বাবু একেবারে উত্তং পুত্তং মহারাগ—রাগের উপর বক্তৃতা। কালী বাবু হয় চুপ

করিয়া থাকিতে বা একটু বিনয় দেখাইতে পারিতেন, তা না করিয়া জবাব দিলেন, 'তাতে হয়েছে কি?' সঙের পালা চলিল, কয়জন হিন্দুস্থানী আরোহী ছিলেন, তাঁহারা কিন্তু একটা কথা বলিয়া পালা ভাঙ্গিয়া দিলেন। বলিলেন, "বাবু সাহেব! স্বদেশীর দিনে এমন করিতে নাই।" স্বদেশীর জয় হইল ও পালা একরূপ বন্ধ হইল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

এক ঘণ্টা পরে নাটোরে পৌঁছিল। আমি জানিতাম নাটোরের সন্দেশ ভাল। এত বয়স হইল, কিন্তু কোথায় কোন্ জিনিস্ ভাল পাওয়া যায় সেটী আমার মুখস্থ আছে। মানকরে কদ্মা, মোকামায় মাখন—এ সকল এখনও ভুলি নাই। অচ্যুতকে বলিলাম—নাটোরের সন্দেশ কিনিতে; তাহা জলযোগ হইল।

বড় গ্রীষ্ম, আমরা সকলেই জানালাগুলি খুলিয়া দিয়াছিলাম, আমি কেবল আমার মাথার কাছের দুটী বন্ধ করিয়াছিলাম। ঘুমাইয়া পড়িয়াছি—ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখি মহা ঝড় বৃষ্টি চলিতেছে, ঘরগুলি সমস্ত বিষম ঠাণ্ডা হইয়াছে; আমাকে একটু সর্দ্দি লাগিয়াছে। সকলেই জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন। আবার নিদ্রা—নিদ্রাভঙ্গে দেখা গেল ভোর হইয়াছে। একটু বেলা হইলে আমরা শিলিগুড়ি পৌঁছিলাম। এ রেল শেষ হইল।

শিলিগুড়ি হইতে অতি ছোট রেল। বড় বড় মালপত্র আমরা প্রথম হইতেই ব্রেকে দিয়াছিলাম—সঙ্গে অল্প স্বল্প ছিল; তাহা নাকি কাড়িয়া লইবে; তা করিতে হইল না, আমরা একরূপ সচ্ছন্দেই বসিলাম। শিলিগুড়ি হইতে শুকনা; এইখান হইতে প্রকৃত হিমালয় আরম্ভ হইল; বিরাট ব্যাপার—বিরাট বন—কিরূপে বর্ণনা করিব বুঝিতে পারিতেছি না।

সে গোচারণের মাঠ আর নাই।

অমল শ্যামল তৃণে ঢাকা ধরাতল,
বহুদূর ভোরপুর সবুজ কেবল;

তাহাও আর নাই। তিউর, বা পরেশনাথও আর নাই—

পাহাড়ীর ঢালু গায় চরে গাভীদল

সে সকল কিছুই নাই।

হিমালয় প্রদেশের বনভূমি—গাছ পালা, লতা পাতার—সমুদ্র,—লিখিতে

যাইতেছিলাম, সমুদ্র যে সম ধরাতল। গাছ পালা লতা পাতার অনন্ত বিচিত্র জটিল সংঘটন। সমুদ্র দেখিলে অনন্তের আভাস পাওয়া যায়; সুনীল আকাশেও অনন্ত—অনন্ত কোমলতা; নক্ষত্রপুঞ্জ খচিত পরিষ্কার আকাশেও অনন্ত—অনন্ত সুন্দর—মধ্যে মধ্যে বিদ্যুদ্দাম স্ফুরিত গভীরা ত্রিযামার মসীময়ী ঘোর বিকট শব্দে শব্দায়মানা নভঃস্থলীতেও অনন্ত—সে অনন্ত কে যেন আর এক রূপ বিরাটতর অনন্ত সান্ত করিয়া রাখিয়াছে; হিমালয় প্রদেশের বনভূমি সেইরূপ—যেন মহান্ অনন্তদেবের বিরাট মায়াময় খেলাঘর। এমন খেলা বুঝি আর কোথাও নাই! বিশাল ক্ষুদ্রকে আশ্রয় দিয়াছে, আলিঙ্গন করিয়াছে, মাথায় তুলিয়াছে। কত শত বিশাল শাল্মলী তরুর পাদদেশে সহস্র আয়ত চক্ষু মেলিয়া ধুস্তূরা চাহিয়া আছে বন্যলতা পুঞ্জীকৃত পাতা লইয়া শাল্মলীর বক্ষঃ বেষ্টন করিয়া আছে; আর বন্য বেগ্নোলিয়া রাশি রাশি লাল ফুল বিছাইয়া শাল্মলীর কাঁধে চড়িয়া মাথায় ছাতা ধরিয়া আছে। উৎকটে কোমলে, বিশালে সুন্দরে—কি অপূর্ব্ব মাখামাখি!

এমন বিশৃঙ্খলায় শৃঙ্খলাও আর কোথাও দেখি নাই। বিশৃঙ্খলা বলিব, কি শৃঙ্খলাপূর্ণ বলিব,—তাহা বুঝিতেই পারি না। সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে বৈচিত্র; আকাশে বায়ুভরে বৈচিত্র—এই একরূপ, আবার পরক্ষণেই অন্যরূপ। বনভূমির বৈচিত্র অন্যরূপ। ছোট বড় বৃক্ষ,—সূক্ষ্ম স্থূল লতা পদে, উরুতে, কটিদেশে, বক্ষে, বাহুতে, স্কন্ধে জড়াইয়া লইয়া,—নিচল, নিথর, অনড়, অসাড় দাঁড়াইয়া আছে। নাইবা থাকিল—পবন-বেগ, নাইবা থাকিল চলৎ-মেঘ, আপনাদের গাম্ভীর্য্যে, স্থৈর্য্যে, সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে আপনারা ভোর হইয়া দাঁড়াইয়া আছে—এই এক বৈচিত্র। দাঁড়াইয়া আছে—কোথায়? পর্ব্বতের শিরোদেশে, স্কন্ধে, সানুদেশে, অধিত্যকায়, উপত্যকায়, গুহায়, গহ্বরে, খালে, জোলে, পাতালে। সর্ব্বত্রই উদ্ভিদ সৌন্দর্য্য, সর্ব্বত্রই বনস্পতির রাজ্য। যিনি বনপতি না বলিয়া, বনস্পতি বলিতে ব্যাকরণের ছলনায় উপদেশ দিয়াছেন,—তিনি ধন্য—তিনি সত্য সত্যই এই বনস্পতিগণের পরিচয় পাইয়াছিলেন। হসন্ত দন্ত্যসয়ে কি অদ্ভুত মহিমাই প্রকাশ পাইয়াছে।

এই বনস্থলীতে, কায়ব্যূহময়ী বিভীষিকা, কায়ব্যূহময় সৌন্দর্য্যকে গাঢ়

আলিঙ্গনে ধরিয়া রাখিয়াছে। যেন অর্দ্ধনারীশ্বর। সুন্দরে চিত্তবিনোদন হয়, বিভীষিকায় সন্ত্রাস জন্মে, কিন্তু সুন্দর বিকটের বিচিত্র সম্মিলনে হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দ হয়।

তুমি আমি সকলেই সরলের প্রশংসা করি, সরলতা ভালবাসি। ভালবাসি সরলা কামিনীর রূপ, অদন্ত শিশুর মধুর হাসি, ফুলের সুগন্ধ, ফলের মিষ্টতা; ভালবাসি প্রেমের অশ্রু, দয়ার দ্রাবকতা; ভালবাসি সরলের সরলতা। এই বনভূমিতে বনস্পতিমণ্ডলীর বিলাস-লীলা কিন্তু বড়ই জটিলতাময়ী। শাখায় শাখায়, শাখায় লতায়, লতায় লতায়—ক্ষুপেতে, গুল্মেতে লতায়, পাতায়, এমন জটিলভাবে জড়াজড়ি, তলভূমিতে এতই জঙ্গল, যে সেই জটিলতায়, সেই জঙ্গলে হাতীর উপর হাতী, তার উপর হাতী থাকিলেও দেখিতে পাওয়া যায় না। এই জটিল জঙ্গলময়ী বনভূমি দিনেই অসূর্য্যম্পশ্যরূপা, অন্ধকার নিশীথে কি বিভীষিকাময়ী। মনে করিতেও অঙ্গ কণ্টকিত হয়।

কিন্তু এখন এই যে গাড়ী চলিয়াছে—আমরা নিস্পন্দভাবে বনভূমি দেখিতেছি, এখন ইহা কি অপূর্ব্ব শোভাই না ছড়াইতেছে! শ্রীভগবানের লীলা রহস্যময়ী; তিনি স্তন্য পান করিতে করিতে রাক্ষসী পূতনার বধ সাধন করেন; তিনি নারীহস্তসেবিত কুসুম-চন্দনে শোভিত হইয়া কংসদৈত্যের বিনাশ সাধন করেন; তাঁহার শঙ্খনাদে বিশ্বপরিপূরিত, তাঁহার চক্রে বিশ্ব ঘূর্ণায়মান, তাঁহার গদায় সন্ত্রস্ত এবং তাঁহার পদ্মের সৌরভ পিযূসপানে সকলেই পুলকিত। ধন-ধান্যপূর্ণ শোভাময় রাজ্যও যেমন তাঁহার—এই ঘন-বিজন-কানন, শাল্মলী, শাল, শিশু, চম্পক, কদম্ব, কোবিদার,—চিলানী পানী, লীম্পতিগা পূর্ণ নিবিড় অরণ্যও তাঁহারই লীলাখেলার বিচিত্র বোটানিক্যাল গার্ডেন। বলিহারি ইহার বৈচিত্র, বলিহারি ইহার জটিলতা—বলিহারি সুন্দরে বিকট,—বিকটে সুন্দর। এই নিবিড় অরণ্যানী ভেদ করিয়া, পাহাড়ের পার্শ্ব দিয়া, ফিরিয়া ঘুরিয়া দার্জ্জিলিঙ্গ-হিমালয় রেলগাড়ী ছুটিয়াছে। ৺তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'দার্জ্জিলিঙ্গ প্রবাসীর পত্রে' বলিতেছেন, "রেলগাড়ী আরোহী লইয়া গর্ভবতী ললনার মত হেলিয়া দুলিয়া মন্থর গতিতে চলিতে আরম্ভ করিল।" এটি ১৮৯৫ সালের কথা—এখন এই

১৯০৮ সালে, ভূমিকর্ষণকারী আতসবাজীর মত—শোঁ শোঁ শব্দ করিতে করিতে ছুটিতে লাগিল। আর যদি কোন ললনার উপমা দেওয়াই প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, আজি কালি কলিকাতায় যেমন ট্রাম গাড়ীর নীচে কিছু শব্দ হইলে ফিরিঙ্গী রমণী ঘাগরা গুটাইয়া, উর্দ্ধশ্বাসে ট্রামের বিপরীত দিকে বেগে ছুটিতে থাকেন, সেইরূপ ভাবেই ট্রেন চলিতে লাগিল।

বিশ্বপতির এই বিপুল বিরাট—বিশ্ব-কাননের মধ্য দিয়া, ক্ষুদ্র মানবও তাহার বেশ বাহাদুরি দেখাইয়াছে। গাড়ীত নয় যেন বাজিকরের বাজি; এই ঘুরিতেছে, এই ফিরিতেছে, এই ধনুকের মত হইয়া চলিয়াছে, এই তীরের মত ছুটিয়াছে, এই চাকার মত হইয়া ঘুরিয়া আসিল, এই পীপড়ার সারির মত পর্ব্বত-গাত্রে আস্তে আস্তে উঠিতেছে—বাজিকরের বাজি ব্যতীত আর কি বলিব? মানুষ যে বড় বাজিকরের বেটা—ছোট বাজিকর;—মানুষ তাহার প্রমাণ এইখানে একরূপ করিয়াছে। তবে মধ্যে মধ্যে গাড়ী এত ধার দিয়া দৌড়িতে থাকে যে মনে হয়, এইবার বুঝি মানুষের বাহাদুরি শেষ হইল; আমরা মারা পড়িলাম। সোমবার প্রায় বেলা ১১টার সময় আমরা কর্শিয়ং ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। সমুদ্র সমতল হইতে আমরা প্রায় ৫০০০ ফুট উর্দ্ধে উঠিয়াছি। সেই দিনই আমাদের দার্জ্জিলিঙ্গ যাইবার কথা ছিল। কিন্তু আমাদের পিতাপুত্রের তাহা হইল না। শ্রীমান্ শরচ্চন্দ্র পাঠক ষ্টেশনের কর্ম্মচারী, ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন; তিনি আমার সুপরিচিত হইলেও আমি তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই। তিনি পরিচয় দিয়া, আমাদের যত্ন পূর্ব্বক নামাইয়া লইলেন। বহুপূর্ব্বে তাঁহার পিতা গোয়ালন্দে কর্ম্ম করিতেন। ঢাকা যাতায়াতের অবসরে তাঁহার বাসায় দৌরাত্ম্য করিতাম, সুতরাং শরচ্চন্দ্রের বাসায় যাইতে কিছু কুণ্ঠা বোধ করিলাম না—বুঝিলাম, আতিথ্য-রোগ পুরুষ পরম্পরা চলে। শ্যাম বাবু কালী বাবু আমাদের ছাড়িতে নেহাইত নারাজ, তবে একেবারে বারণ করিতেও পারিলেন না। তাঁহাদের গাড়ী ছাড়িয়া দিল, আমরা জিনিসপত্র লইয়া, শরচ্চন্দ্রের বাসার পার্শ্বে একটী খালি বাড়ীতে আসিলাম। শরতের সুন্দর আতিথ্যে স্নানাহারের পর নিদ্রা। দিবা নিদ্রার পর শরীর ভার ভার গলার

সর্দ্দি হইল; প্রায়শ্চিত্ত করিতে বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইলাম, পথশ্রম, দূরদেশে ভ্রমণ—শারীরিক কষ্ট, অর্থ নষ্ট—সকলই সার্থক হইল। আমি কর্শিয়ংএর গির্জার নিম্ন প্রদেশ হইতে এই সোমবারের শুভ বৈকালে—কাঞ্চন জঙ্ঘা প্রভৃতি হিমালয়ের পাঁচটী শৃঙ্গ দেখিতে পাইলাম—রজত তাম্বুর মত ঝক্‌মক্ করিতেছে। পরদিন প্রাতঃকালে আবার সেই স্থানে গিয়া সেই অপূর্ব্ব বিচিত্র দৃশ্য দেখিলাম; মনে করিলাম আর দার্জ্জিলিং না গেলেও চলে, গৌরীশঙ্কর দর্শন আমার ভাগ্যে নাই।

মঙ্গলবার, সেই দিন, সকাল সকাল আহারাদি সারিয়া আবার সেই মেল ট্রেন ধরিলাম। অপরাহ্নের পর দার্জ্জিলিং পৌঁছিলাম। স্বাস্থ্যাবাসের লোক আমাকে আদর করিয়া, মুটেনিকে দিয়া জিনিসপত্র লইয়া, সঙ্গে লইয়া চলিল। পরে বুঝিয়াছি, সে আদর ভ্রম ক্রমে করিয়াছিল। কেননা আমাদের জন্য স্থান সঙ্কুলান করা ভার হইয়া উঠিল। শেষে একটা নিতান্ত অপকৃষ্ট একতালা ঘরে আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর হিসাবে ভাড়া দিয়া রহিলাম। তিন দিন পরে প্রথম শ্রেণীতে আসিয়াছি। এ ঘর অবশ্য উপর তলায়, এবং বড় শড়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; আলোক বাতাস বেশ আছে।

কুচবিহারের মহারাজ ৫০,০০০৲ টাকা মূল্যের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড দান করাতে এই স্বাস্থ্যাবাসের পত্তন হইয়াছে। রঙ্গপুরের রাজা গোবিন্দলাল রায় ৯০,০০০৲ টাকা, এবং রঙ্গপুর জেলার ডিম্‌লার রাজা জানকীবল্লভ সেন ঐরূপ অর্থ দান করাতে এই সুবৃহৎ ভবন হইয়াছে, আরও বহুতর লোক, এজন্য দান করিয়াছেন। স্থানটী কিন্তু ভাল নহে। ষ্টেশনের নিকটেই বটে, কিন্তু ষ্টেশন হইতে ৫।৬ তলা নিম্নে, এবং প্রায় চারি দিকেই সুচ্চ পাহাড় ও বৃক্ষরাজিতে বেষ্টিত; খোলা হাওয়া প্রায়ই পাওয়া যায় না। স্বাস্থ্যাবাসের এইরূপ অবস্থান, একটী মহা বিড়ম্বনা বলিতে হয়।

আর এক বিড়ম্বনা—ইহার নিষ্ঠাচার হিন্দু-বিভাগ, (Orthodox-Hindu Department) Orthodox শব্দে নিষ্ঠাচার লিখিয়া ঠিক করিলাম কি না, বলিতে পারি না, তবে এই বিভাগে নিষ্ঠাচার কিছু নাই, তাই বলিতেছি। সন্ধ্যা আহ্নিকের ব্যবস্থা ইত্যাদি কিছুইত নাই। পলাণ্ডু পর্য্যন্ত মাংসে প্রত্যহ চলিতেছে। আর আচমনী, অনাচমনীয়—সে সকল বিভাগের কোন

গোলযোগই নাই। তবে লেপ্‌চ ম্লেচ্ছ পাহাড়ীর দেশে একটা হোটেলে আসিয়া কোনরূপ হিন্দুয়ানির দাবি করা, নিতান্ত অসঙ্গত; কিন্তু নামটা Orthodox আছে বলিয়াই এত কথা, নতুবা Heterodox Hindu department বলিলেই সকল গোল মিটিয়া যাইত; শুনিতেও বেশ অনুপ্রাস হইত।

আচারের কথা ছাড়িয়া দিলে স্বাস্থ্যাবাসে আহারের বন্দোবস্ত বেশ ভাল; চিকিৎসার জন্য বেশ সুযোগ্য ডাক্তার আছেন, ভাল ঔষধালয় আছে। ডাক্তার বাবুকে ফীচ্ দিতে হয় না, ঔষধের মূল্য লাগে না। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু হরিমোহন চন্দ্রের উদ্যোগেই এই স্বাস্থ্যাবাস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; এখনও তিনি এই স্বাস্থ্যাবাসের তত্ত্বাবধারক শ্রেণীর সম্পাদক এবং প্রত্যহই ইহার পরিদর্শন করিয়া থাকেন। তিনি বলেন, যে এই স্বাস্থ্যাবাসটী আর একটু বিস্তৃত করিয়া দিতে পারিলে, তিনি তাঁহার জীবন সার্থক মনে করিবেন; কথাটী পরম সত্য, স্বাস্থ্যাবাসই তাঁহার প্রাণের স্বরূপই বটে।

খুলনা জেলার দৌলতপুর কলেজের ছাত্রাবাসের তত্ত্বাবধারক একজন অধ্যাপক। সেইরূপ তত্ত্বাবধানে হরিমোহন বাবু যদি এই স্বাস্থ্যাবাসের একটী বিভাগ খুলিতে পারেন, তাহা হইলে, ধন্য হইতে ধন্যতর হইবেন।

দার্জ্জিলিংয়ের বোটানিকাল বাগান দেখিবার জিনিস। পার্ব্বতীয় প্রদেশের বিস্তর মহীরুহ এইখানে জন্মিয়াছে; অপূর্ব্ব শৃঙ্খলায়, এবং শোভায় বর্দ্ধিত হইতেছে; এরূপ কলিকাতার নিকট শিবপুরেও নাই। ভারতবর্ষে বোধ করি আর কোথাও নাই। সমতল ভূমিতে অপূর্ব্ব উপবন, একরূপ পদার্থ, আর এই উচ্চে নীচে, শিখরে, গহ্বরে বনস্পতির বৃক্ষরাজির ক্ষুপ গুল্মের খেলা, আর এক কাণ্ড। এখানে খোদার কার্য্যের উপর মানুষ খোদকারি করিয়াছে। মহেশের মহৈশ্বর্য্য অসীম; মানবের এই সসীম ঐশ্বর্য্যে মানবেরও গৌরব করিবার আছে। মোটের উপর দার্জ্জিলিং সহরটাই সর্ব্বত্র খোদার উপর খোদগারি। পর্ব্বত শিখরের উপর সৌধ চূড়া। তবে অন্যান্য সহরে যেমন মানবের কৃত্রিমতাই বেশী বেশী এখানে সেরূপ নহে; স্বভাবের শোভাই জাজ্বল্যময়ী—মানব, নোক্তাচুনী করিয়াছে মাত্র। ছোট লাটের বাড়ী, বর্দ্ধমানের মহারাজের বাড়ী, (Mall) মল নামক ছোট চৌরঙ্গী,

এ সকলই মানবের ঝাড় বুটি করিবার পরিচয়। কিন্তু দার্জ্জিলিংয়ে স্বভাবকে পরাস্ত করিবার কোন উপায় নাই। যতই বাড়ী কর, চূড়া বনাও স্বভাবের মেঘমালা আসিয়া মুহূর্ত্তে সে সকল ঢাকিয়া ফেলিবে। বুঝাইবে মানব গর্ব্ব অসার।

দার্জিলিঙ্গে মেঘের খেলা বড়ই মহিমাময়ী। আমাদের দেশের মেঘ আমাদের হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ; হতে পারে দেবতার মায়া, হতে পারে স্বর্গের ছায়া, হতে পারে তুলার বস্তা, হতে পারে বাষ্পরাশি, যাহাই হৌক, মেঘ আমাদের হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; দূরে, দুর্ল্লভ, অস্পৃশনীয়। সেখানে মেঘ কেবল দর্শনীয় মাত্র। এখানে মেঘ অসীম হইলেও, বিরাট হইলেও, লীলাময় হইলেও, ছায়াময় হইলেও, আমাদের নিতান্ত ঘরের লোক। ঘরে আসিতেছে, কাপড় শুকাইতে দেয় না, এই অন্ধকার করে, এই রৌদ্রের তেজ বাড়াইয়া ঝক্ ঝক্ করিতেছে। এই আমাকে ঘেরিয়া রাখিয়াছে, এই আমা হইতে চলিয়া গিয়াছে। এই নাচিতেছে, এই ধীর গম্ভীর হইয়া নীথর দাঁড়াইয়া আছে। যাহাই হৌক,—মেঘ কিন্তু আমাদের ঘরের লোক। দেখিলে আনন্দ হয়, আবার ব্যবহারে রাগ হয়; ঘরের লোকের সঙ্গেও ত সেইরূপ হইয়া থাকে। এই মেঘের লীলাখেলার বর্ণনা করা অসাধ্য, বঙ্গ সরস্বতী আমাকে মার্জ্জনা করিবেন, বোধ করি বাঙ্গালা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর রস্কিনের লেখনীতে মেঘমালার বর্ণনা পাঠ করিয়াছি, বাঙ্গালার সেরূপ লেখা অসম্ভব। আর রস্কিন স্বভাবের চিত্রকর, আমি সে বিচিত্র তুলিকা কোথায় পাইব? বাস্তবিক এখানে আসিয়া কবি হইতে ইচ্ছা হয়! এই সেই অস্ত্যুত্তরস্যাংদিশি—দেবতাত্মা হিমালয়নাম নাগাধিরাজ—কিন্তু সে সরস্বতীর বরপুত্র সকল কোথায়?

হিমালয় প্রদেশে আসিয়া কবি বেহারীলাল চক্রবর্ত্তীর সারদামঙ্গলে হিমালয় বর্ণন শতবার মনে পড়িতেছে, কিন্তু মিলাইয়া উঠিতে পারিতেছি না,

বিশ্ব যেন ফেলে পাছে,
কি এক দাঁড়ায়ে আছে!

কথাগুলি বেশ! কিন্তু এরূপ ভাবভক্ত কোথাও দেখিতে পাই না। বরং এরূপ দেখিতে পাইলাম।

ওই কি হে ধব ধব
তুঙ্গ তুঙ্গ শৃঙ্গ সব
উর্দ্ধমুখে ধেয়ে গেছে ফুড়িয়া অম্বর।
দাঁড়াইয়া পাদদেশে
ললিত হরিত বেশে
নশ্বর নিকুঞ্জরাজি সাজে থরে থর!

এটীও বেশ মিলান যায়;—

কিবে ওই মনোহারী
দেবদারু সারি সারি
দেদার চলিয়া গেছে কাতারে কাতার।
দূর দূর আল বালে,
কোলাকুলি ডালে ডালে,
পাতার মন্দির গাঁথা মাথায় সবার।

সকল স্থল মিলাইতে পারি, আর নাই পারি,—পাঠক একবার চক্রবর্ত্তীর হিমালয় বর্ণন পাঠ করিবেন; আমার লিখিতে না পারার ক্ষোভ রহিল, আপনাদের কেন ক্ষোভ থাকিবে। আমার অনুরোধ রক্ষা করুন, আর অদ্য আমাকে বিদায় দিউন। আজি জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তি পূর্ণিমা, আগামী কল্য একবার আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে, পর্ব্বতে মেঘের খেলা দেখিয়া মেঘদূত-কারকে স্মরণ করিব, লিখিতে পারিব না। মঙ্গলবারে পুনর্যাত্রা আরম্ভ করিব মনে করিতেছি। কনিষ্ঠ পুত্র সঙ্গে আসিয়াছে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহার লেখা অভ্যাস একটু আধটু আছে, পাঠক তাহার পরিচয় পূর্ব্বেই পাইয়াছেন, সেই ভাল করিয়া দার্জ্জিলিং দেখিয়াছে, আষাঢ়ে তাহাকে দিয়া দার্জ্জিলিং ও ঘুম বর্ণনা লেখাইব মনে করিতেছি।

জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমাসংক্রান্তি।
দার্জ্জিলিং।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

হুগলী কাহিনী।

হুগলী এবং হাওড়া জেলার অধিবাসীগণে নিকট বিনীত নিবেদন।

হুগলী-কাহিনীর দ্বিতীয় সংস্করণ সত্বর প্রকাশিত করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। অনেকের অনুরোধে এবার হাওড়া জেলার বিবরণও ইহাতে সন্নিবেশিত হইবে। তাহা ছাড়া প্রত্যেক পল্লীর ঐতিহাসিক ও জনশ্রুতি মূলক কাহিনী, গ্রাম্য দেবতা ও দেব-মন্দিরের এবং তৎসংক্রান্ত বিশেষ পর্ব্ব বা মেলার বিবরণও ইহাতে যথাসাধ্য সংগৃহীত থাকিবে। সর্ব্বত্র গমন করিয়া তথ্য সংগ্রহ করা সহজসাধ্য নহে, সেজন্য হুগলী এবং হাওড়া জেলার অধিবাসী-গণের নিকট সানুনয় প্রার্থনা তাঁহারা স্বীয় স্বীয় পল্লীর বিবরণ সংগ্রহ করিয়া আগামী ৩০শে আশ্বিনের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন। কোনও দ্রষ্টব্য স্থানের ফটো পাঠাইলে তাহাও সাদরে গৃহীত হইবে। পল্লীবাসীগণ একটু মনোযোগী হউন, নতুবা তাঁহাদের পল্লীর বিবরণ "হুগলী-কাহিনী"তে স্থান প্রাপ্ত হইবে না, এবং পুস্তকখানিও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। আমাদের সনির্ব্বন্ধ নিবেদন কেহ যেন স্বকপোল কল্পিত কথা না লিখেন। বিবরণগুলি হস্তগত হইলে পর আবশ্যক মনে করিলে পল্লীভ্রমণ করিয়া লেখক স্বয়ং অথবা প্রতিনিধি প্রেরণ দ্বারা প্রেরিত বিবরণের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিয়া পুস্তক মধ্যে লিপিবদ্ধ করিবেন।

বিনীত নিবেদক—

"হুগলী-কাহিনী" প্রকাশক।

পূর্ণিমা কার্য্যালয়—বাঁশবেড়িয়া।

দেশভ্রমণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পূর্ব্বপত্রে তোমাকে তসর-চাষ সম্বন্ধে কয়েকটা সংবাদ দিয়াছি। ইতিমধ্যে আমরা তসর-চাষ ও খাসমহল সম্বন্ধে শিক্ষা শেষ করিয়াছি। ২।৩ দিনের মধ্যে আমরা মফস্বল পরিদর্শনে বাহির হইব। এ দেশের মফস্বল ও পল্লীগ্রামের যাবতীয় কথা পরে জানিতে পারিবে। এই জেলার রাজ্য-শাসন সংক্রান্ত কয়েকটী কথা আজ লিখিতেছি।

এই জেলায় চারি প্রকার Estate আছে। (১) "সরাইকেলা" ও "খরসোয়ান" নামে দুইটী স্বাধীন রাজ্য (Political State)। (২) "পোড়া-হাট" জমিদারী। ইহার জমিদারকে জমীর জন্য গবর্ণমেণ্টকে কোনরূপ কর দিতে হয় না; এটী Revenue-free State। তবে সরকারী পুলিশের খরচার দরুণ, গবর্ণমেণ্টকে বাৎসরিক ২,১০০টাকা দিতে হয়। (৩) "ধলভূম" রাজ্য। এই স্থানের জমিদারকে রাজা বলে; ঘাটশীলা ধলভূমের প্রধান নগর। ২ বৎসর যাবৎ এই রাজ্য ঋণগ্রস্ত (Encumbered) হওয়ায়, ডেপুটী কমিশনার ইহার তত্ত্বাবধানের ভার লইয়াছেন। ধলভূম হইতে গবর্ণমেণ্ট বাৎসরিক ৪,২০০ টাকা, জমীর কর স্বরূপ পাইয়া থাকেন। ইহা ভিন্ন পুলিশ-কমিশন ও নানাবিধ সেস্ তথা হইতে আদায় হয়। পোড়াহাট ও ধলভূমের রাজা জাতিতে ক্ষত্রিয়। (৪) গবর্ণমেণ্ট খাসমহল "কোলহান" রাজ্য।

১৮২০ খৃষ্টাব্দ হইতে কোলেরা ইংরাজের সম্পর্কে আসিয়াছে। তৎকালে সিংভূম, নিকটবর্ত্তী ছোটনাগপুর রাজ্যের পলাতক দুর্বৃত্ত দস্যুগণের আশ্রয় স্থল বলিয়া বিবেচিত হইত। সিংভূমের লারকা অর্থাৎ যুদ্ধব্যবসায়ী কোলগণ পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে প্রায়ই লুণ্ঠনাদি হত্যাকাণ্ড করিয়া, সেই সকল স্থানের অধিবাসীদিগকে নানারূপে উৎপীড়িত করিত। সরাইকেলা ও খরসোয়ানের রাজাগণ পোড়াহাটের অধিকার হইতে, নিজেরা পৃথক হইয়া, বিস্তৃত ভূমির উপর আধিপত্য করিলেও, সিংভূমের অন্যান্য সকল অংশই এক

প্রকারে পোড়াহাটের রাজার অধীনে ছিল। পারকা কোলগণ, তাহা-দিগের আসুরিক ব্যবহারে, রাজার কণ্টকস্বরূপ হইয়া উঠিল। গবর্ণমেণ্ট এই প্রকার লুণ্ঠনাদি দুর্ব্বৃত্তাচরণ দমন করিবার অভিপ্রায়ে, পোড়াহাটের রাজার সহিত সখ্য-স্থাপন করিলেন এবং তাঁহাকে কয়েকটী সর্ত্তে আবদ্ধ করিয়া, তাঁহাকে এবং সরাইকেলা ও খরসোয়ানের অধিপতিকে সৈন্য সাহায্য করিয়া, কোলগণকে বশ্যতা স্বীকার করাইলেন। কোলেরা ১৮২১ সালে, এই প্রথমবার, প্রতি লাঙ্গলের হিসাবে আট আনা করিয়া জমিদারকে খাজনা দিতে লাগিল। কিন্তু এইরূপ বন্দোবস্ত বেশী দিন চলিল না; কারণ রাজাগণ কোলদিগকে তাঁহাদের অধীনে রাখিতে পারিলেন না। ১৮৩০ সাল হইতে ১৮৩৬ সাল পর্য্যন্ত দেশের চারি দিকে যুদ্ধবিগ্রহাদি উপস্থিত করিয়া রক্তে দেশ প্লাবিত করিয়াও, অধিপতিগণ স্ব স্ব কর আদায় করিতে পারিলেন না। ইংরাজ রাজও এইরূপ একটী সুযোগ খুঁজিতে ছিলেন। আবার তিনি আসরে নামিলেন; এবার আর সেই পূর্ব্বের বন্ধুভাব নাই; নিজের কাজ গুছাইয়া লইলেন। উক্ত তিনটী অধিপতির রাজ্য হইতে ২৩টী কোল "পির" অথবা পরগণা, এবং ময়ূরভঞ্জ রাজ্য হইতে ৪ পির, পৃথক করিয়া লইয়া, সরকার বাহাদুর, নিজের সম্পূর্ণ অধীনে, কোল্‌হান নামে একটী রাজ্য স্থাপনা করিলেন। গবর্ণমেণ্টের এই policy, আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কি বুঝিব? তোমাদের বাঙ্গালি ইতিহাস লেখক গবর্ণমেণ্টের এই প্রকার ব্যবহারকে "Good stroke of policy" বলিলেও, আমি যখনই ইতিহাসে গবর্ণমেণ্টের রাজ্য বিস্তার (Annexation) সম্বন্ধে কোন কথা পড়ি, তখনই কমলাকান্তের উক্তিটী মনে পড়ে,—Right of Conquest যদি একটা right হয়, তবে Right of theft, কি একটা right নয়?" এই রাজ্যে এ কথার মীমাংসা হইতে পারে না।

কয়েকখানি গ্রাম লইয়া এক একটী "পির" বা পরগণা হয়। "মান্‌কি" পিরের প্রধান ব্যক্তি। প্রত্যেক গ্রামে একজন করিয়া সর্দ্দার বা মোড়ল থাকে। এখানে গ্রামের মোড়লকে "মুণ্ডা" বলে। গ্রামের মুণ্ডাগণ, সেই পিরের মান্‌কির অধীনে। মুণ্ডাগণ গ্রামের প্রজাদিগের নিকট হইতে খাজানা আদায় করিয়া, মান্‌কিকে প্রদান করে। মান্‌কি মুণ্ডাদিগের

মারফৎ খাজনা আদায় করিয়া, বৎসরে দুই কিস্তিতে জেলার ট্রেজারীতে দাখিল করে। যথাসময়ে কিস্তির টাকা জমা দিতে না পারিলে, ডেপুটী কমিশনার ইচ্ছা করিলে, মান্‌কির স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া টাকা আদায় করিয়া লইতে পারেন। মুণ্ডাও সময়ে মান্‌কিকে খাজানা দিতে না পারিলে, তাহারও দশায় ঐরূপ ঘটে। এই মান্‌কি ও মুণ্ডারা গ্রামের সকল বন্দোবস্ত করে। মান্‌কিগণ পিরের প্রধান পুলিশ কর্ম্মচারী; মুণ্ডারা ইহার অধীনে পুলিশের নিম্নকর্ম্মচারী। মুণ্ডা প্রজাদিগের নিকট হইতে খাজানা আদায় করে বলিয়া শতকরা ১৬৲ টাকা কমিশন পায়। মান্‌কিও সেইরূপ পিরের সকল খাজানা কালেক্টরীতে দাখিল করে বলিয়া শতকরা ১০৲ টাকা কমিশন পায়। মুণ্ডার কার্য্যের সহায়তা করিবার জন্য, প্রত্যেক মুণ্ডার এক জন করিয়া "তসিলদার" ও এক জন করিয়া "ডাকুয়া" নামে চাকর থাকে। তসিলদার টাকা আদায় দরুণ শতকরা ২৲ টাকা হিসাবে কমিশন পায়। এইরূপে শতকরা ২৮৲ টাকা খরচা করিয়া বাকি ৭২৲ টাকা খাজানা ট্রেজারীতে পৌঁছায়। মান্‌কি ও মুণ্ডাগণ হিন্দি বলিতে পারে ও সামান্য হিন্দি লেখা পড়া জানে। হিন্দি এই জেলার Court language লেখাপড়া জানা না হইলে, মান্‌কি কিম্বা মুণ্ডাগিরি মেলে না। গবর্ণমেণ্ট এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দেশীয় কোলদিগের দ্বারা আজ কাল বেশ সুশৃঙ্খলে রাজ্য শাসন করিতেছেন। সরকারের শাসনে আসিয়াও কোলেরা প্রথম প্রথম খাজানা দিতে অস্বীকার করিত। বলিত "সরকারকে খাজানা দিব কেন? এ জমি ত সব সূর্য্যদেবের। আমরা সেই জমি বাপ পিতামহের আমল হইতে চাষ বাস করিয়া আসিতেছি। জমিতে লাঙ্গল দিবার পূর্ব্বে, আমরা দেবতার নিকট একটী করিয়া মুরগি বলী দিয়া থাকি। তিনি সেই মুরগি পাইয়া বরাবর সন্তুষ্ট আছেন।" এখনও এমন ২।৪ জন কোল দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা বুঝিতে পারে না যে কেন তাহারা সরকারকে খাজানা দিবে। কিন্তু রুলের গুঁতা তাহাদিগকে সেই কথা বুঝাইয়া দেয়।

১৫ই আগষ্ট, বৃহস্পতিবার ঠিক চারিটার সময়, ঘোর বারবেলার মধ্যে আমি ও সামন্ত, গো-যানে চাইবাসা ছাড়িলাম। যে দুই তিন খানি

ঘোড়ার গাড়ী আছে, তাহারা চাঁইবাসা হইতে চক্রধরপুরে আরোহী লইয়া যাইতেই সময় পায় না। আর আমরা কাঁচা পথেও ঘুরিব, সুতরাং পুস্‌পুস্‌ও পাওয়া গেল না। মঙ্গলবার রাত্রে আমাদের যাত্রা করিবার কথা ছিল। কিন্তু এই বর্ষাকালে, ৮।১০ দিন ধরিয়া মফস্বলে, বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতে কোন গাড়োয়ানই রাজি হয় না। গাড়ী পাওয়া দায় হইল। সব্ ডেপুটী সাহেবকে সেই কথা জ্ঞাপন করিলাম। তিনি পুলিশের সব্ ইন্‌স্পেক্টরকে তৎক্ষণাৎ লিখিত কড়া হুকুম দিলেন যে আমাদের গাড়ী ঠিক করিয়া দেওয়া হউক। চারি দিকে লাল পাগড়ী ছুটিল। বুধবারে কয়েকখানা গাড়ী হাজির করিল বটে, কিন্তু একটাও গাড়োয়ান দেখিলাম না। প্রহারের চোটে তাহারা গাড়ী গরু ফেলিয়া প্রাণভয়ে পলাইয়াছে। গাড়োয়ান বিহীন শকট লইয়া কি করিব। আবার আপিসে গিয়া গাড়ীর দুর্দ্দশার কথা জানাইলাম। এবার নাজিরের উপর গাড়ী ঠিক করিয়া দিবার হুকুম হইল। লাল পাগড়ির পরিবর্ত্তে, চাপরাসধারী পেয়াদা, পিওন প্রভৃতি প্রায় ২০।২৫ জন কাছারীর লোক গাড়ী পাকড়াও করিতে চারি দিকে বাহির হইল। মিলিটারী forceএ কোন ফল হয় নাই, এবার সিভিল force কাজ করিল। বৃহস্পতিবার প্রায় ৩টার সময় গাড়োয়ান সমেত গো-যান হাজির করিল। গাড়োয়ান একজন যজ্ঞোপবীতধারী রজপুত ব্রাহ্মণ।

আমরা মফস্বলে যে সকল গ্রামে যাইব, পূর্ব্ব হইতে স্থির হইয়াছিল, সেই সকল গ্রামের মুণ্ডা ও মান্‌কিকে পূর্ব্ব হইতে, আমাদের গমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করাইয়া, কাছারী হইতে পরোয়ানা পাঠাইয়া দেওয়া হয়। তাহারা যেন আমাদের আগমন প্রতীক্ষা করে।

চাঁইবাসা হইতে বাহির হইয়া ৫ ক্রোশ দূরে জোড়াপুকুর নামে এক ক্ষুদ্র গ্রামে আমাদের Halt করিবার কথা। রাত্রি ৮।৯ টার মধ্যে তথায় পৌছান উচিত ছিল। কিন্তু আমাদের গরু একেবারে চলে না। এক মাইল আসিতে ১ ঘণ্টা লাগিল; একবার ভাবিলাম ফিরিয়া যাইব; কিন্তু ফিরিলাম না! গরুগুলি অনেক মারধর খাইয়া, সমস্ত পথ গালি খাইতে খাইতে, প্রায় ৮টা রাত্রে জোড়াপুকুর হইতে ৩ ক্রোশ দূরে এক গ্রামে আমাদিগকে পৌছাইয়া দিল। এই গ্রামে ৮।১০ ঘর বসতি। গরু একেবারে

অচল; শুইয়া পড়িতেছে। সেই গ্রামের মুণ্ডাকে ডাকাইয়া আনাইলাম; আমরা সরকারের লোক তাহাকে বুঝাইলাম। বলিলাম আমাদের গরু তাড়াইয়া জোড়াপুকুর লইয়া যাইবার জন্য গ্রাম হইতে কুলি দিতে হইবে। সরকারী লোকের হুকুম অগ্রাহ্য করিবার সাধ্য কি? মুণ্ডা সেই রাত্রে চারি জন কুলি অর্থাৎ গ্রামের প্রজা সংগ্রহ করিয়া দিল, তবে বলিল যে জোড়াপুকুর পর্য্যন্ত পৌছাইতে পারিবে না, তথা হইতে ১॥০ দেড় ক্রোশ দূরে এক গ্রাম পর্য্যন্ত তাহারা পৌছাইয়া দিবে। ৪ জন কুলি, স্বয়ং মুণ্ডা ও আমাদের গাড়োয়ান, এই ৬ জনে গরু তাড়াইয়া, গাড়ী ঠেলিয়া, সেই দেড় ক্রোশ দূরের গ্রামে হাজির করিল। আমাদের পূর্ব্বপরিচিত মুণ্ডা গিয়া সেই গ্রামের মুণ্ডাকে বলিল, সরকারী বাবুরা হাজির, এখনই ৪।৫ জন প্রজা দিতে হইবে। প্রায় ১ ঘণ্টা পরে ৩।৪ জন কুলি পাওয়া গেল। তাহারা বহু পরিশ্রম করিয়া, গাড়ী ঠেলিয়া প্রায় রাত্রি ১২টার সময় জোড়াপুকুরে পৌছাইয়া দিল। বোধ হয় বলিতে হইবে না যে, সরকারী লোককে সরকারের প্রজা কুলিগণকে পারিশ্রমিক কিছু দিতে হয় নাই। তাহারা সরকারী লোকের নিকট হইতে কিছু লইতে নারাজ। রাত্রি ঝিম ঝিম করিতেছে; গভীর রাত্রি; ঘোর অন্ধকারে পৃথিবী আচ্ছন্ন,— আমরা জোড়াপুকুরের Road cess বাঙ্গালায় গিয়া উপস্থিত। তখন কোথায় তোমার মুণ্ডা আর কোথায়ই বা আমাদের মান্‌কি? বাঙ্গালা একজন চৌকিদারের জিম্মায় থাকে। এই বাঙ্গালার চৌকিদার ৭০।৮০ বৎসরের এক বৃদ্ধ, বাঙ্গালার দাওয়ায় শুইয়া বর্ষার দারুণ শীত লাগায়, আগুণ পোয়াইতেছিল। সেই বৃদ্ধের সাহায্যে, গ্রামের মুণ্ডাকে ডাকাইলাম, মান্‌কির দেখা পাওয়া গেল না, সে ভিন্ন গ্রামে থাকে। রাত্রি প্রায় ১টার সময় মুণ্ডা, ডাকুয়া, তসিলদার ও গ্রামের ৩।৪ জন প্রজা আসিয়া সেলাম দিল। আমাদের সহিত আহার্য্য কোন সামগ্রী ছিল না; সেই ১০টার সময় চাঁইবাসায় আহার করিয়াছি, পথে ক্রোশখানেক হাঁটিয়াছি; আর প্রায় সমস্ত পথ গরু তাড়াইয়াছি, ক্ষুধার তেজ কিঞ্চিৎ অধিক। মুণ্ডাকে আহার্য্য সামগ্রীর জোগাড় করিতে হুকুম করিলাম। সে যথা আজ্ঞা বলিয়া দলবল হইয়া প্রস্থান করিল। তাহাদের ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া, চৌকি-

মারকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলাম, মুণ্ডা তখন গ্রামের বাড়ী বাড়ী এক এক মুঠা করিয়া চাল সংগ্রহ করিতেছে; সেই চাল সংগ্রহ করা হইলে ফিরিবে। প্রায় এক ঘণ্টা পরে, ৫ মিশিলি (৫ মিশিলি কেন, ২০।২৫ বিলানি) মোটা রক্তবর্ণ চাল, অর্দ্ধ পোয়া আন্দাজ কুল্‌তির ডাল, একটু লবণ ও ২টা হাঁড়ি লইয়া, তাহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিল। কাঠ পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গালায় মজুত ছিল। প্রাতে মান্‌কিকে সঙ্গে লইয়া আসিতে বলিয়া, সে রাত্রের মত মুণ্ডাকে বিদায় দিলাম। বিনা মসলায় কেবল লবণ দেওয়া কুল্‌তির ডাল ও সেই ২০ মিশালি চালের ভাত আমাদের গাড়োয়ান রন্ধন করিল,—আমরা হাসিমুখে, অতি তৃপ্তির সহিত তাহাই ভোজন করিলাম। এমন তৃপ্তিপূর্ব্বক বোধ হয় জীবনে আর কথনও খাই নাই। Hunger is the best sauce. আমরা ভোজনে বসিয়াছি, এমন সময় মুরগি ডাকিয়া উঠিল। তখন রাত্রি প্রায় চারিটা। কোলেরা প্রত্যেকেই মুরগি পুষে। ইহারা দেবতার নিকট মুরগি ও শূকর বলি দেয়। ইহাদিগের অধিকাংশ দেবতাই, ভূত ও দানব। কঠিন পীড়া হইলেও ইহারা ঔষধাদি ব্যবহার না করিয়া দেবতাকে সন্তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে, তাঁহার উদ্দেশে মুরগি বলিদান করে। কোনরূপ ঔষধপত্র ব্যবহার করে না বলিয়া, কঠিন পীড়া হইতে ইহারা প্রায়ই উদ্ধার পায় না। এ দেশের লোকেরা সময়-সংক্রান্ত কোন কথা বলিতে হইলে, হয় প্রাতে মুরগি ডাকা, না হয় সন্ধ্যার সূর্য্যাস্ত, এই দুই বিষয়ের উল্লেখ করে। আমরা ঘড়ী-ছুট হইয়া কোল-দল-ভুক্ত হইয়াছি। সুতরাং মুরগির ডাক শুনিয়া বুঝিলাম রাত্রি শেষ হইতে আর বিলম্ব নাই; এবং যথার্থই কুল্‌তি হজম হইতে না হইতেই, রাত্রি প্রভাত হইল। প্রাতে দেখিলাম গ্রামখানি নেহাৎ ছোট নয়; ২০।২৫ ঘর লোকের বাস আছে। গ্রামের এক ধারে আমাদের বাঙ্গালা। গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার গরু চলিবে কি না। সে বলিল গরু সমস্ত রাত্রি ঘাস খাইয়াছে (অল্প পরেই শুনিলাম, একজন প্রজার জোয়ার ক্ষেত্র উজাড় করিয়াছে) এখন প্রাতে খুব চলিবে।

গো-যান করিয়া পুনরায় আমরা অগ্রসর হইলাম। জোড়াপুকুর হইতে (পরে জানিলাম) ৪॥ ক্রোশ দূরে গামারিয়া গ্রামে আমাদের যাইবার কথা।

এক মাইল গরু বেশ চলিল, পরে আর চলে না। জোড়াপুকুর হইতে গামারিয়া, পথের দুই পার্শ্বে কেবল নিবিড় জঙ্গলপূর্ণ পাহাড়। পথিমধ্যে একখানিও গ্রাম নাই যে মুণ্ডার নিকট তদ্বির করিয়া কুলি জোগাড় করিয়া গরু তাড়াইতে তাড়াইতে গামারিয়া পৌঁছিব। এই পথে রাত্রে গাড়ী চলে না। জঙ্গলে বড় বাঘ। এরূপ জঙ্গল পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। স্বভাবের দৃশ্যগুলি অতি মনোহর নয়নরঞ্জক,—দুই ধারে কেবল ছোট ছোট পাহাড়; পাহাড় হইতে কুল কুল রব করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীগুলি প্রবাহিত হইতেছে। পাহাড়ের চতুর্দ্দিকে কেবল জঙ্গল। জঙ্গলের অধিকাংশ গাছই শাল গাছ। সেই জন্য জঙ্গল অতিশয় নিবিড় হইলেও, গাছের তলায় জমিটী বেশ পরিষ্কার, যেন কে ঝাট দিয়া আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। দৃশ্য খুব মনোহর বটে; কিন্তু কেবল Scenery দেখিলে পেট ভরে কি? কবি এই সকল স্থানের দৃশ্য দেখিয়া, দৃশ্যের সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিতে পারেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের সে অদৃষ্ট কোথায়? বরং এ সকল সুখকর দৃশ্য ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল। প্রায় ১টার সময় গাড়ী হইতে নামিলাম; গরু একেবারেই অচল। সঙ্গে জিনিস-পত্র অনেক। গাড়োয়ানকে একটী মুটে খুঁজিতে পাঠাইলাম। আমরা মুটের জন্য অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময় একটী কোলকে মাঠ হইতে তথায় আসিতে দেখিলাম। আমাদের মোট লইয়া গামারিয়া গেলে, তাহাকে আট আনা পয়সা দিব বলিলাম, সে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। এমনি হাসির ধুম যে হাসির চোটে তাহার দুই পাটি দাঁত বাহির হইয়া পড়িল। তাহার দাঁত দেখিয়া কালিদাসের কাল মেঘের কোলে, সাদা বকের দলের উপমার কথা হঠাৎ মনে উদয় হইল। আমরা তাহার হাসির অর্থের ভিতর প্রবেশ করিতে পারিলাম না। পরে শুনিলাম আট অর্থে কোল-ভাষায় দুই;—দুই আনা মজুরী পাইবে শুনিয়াছিল বলিয়া, তাহার ঐরূপ হাসির ঘটা। যাহা হউক, অনেক চেষ্টা করিয়া একটী মুটে জোগাড় করিয়া তাহার মাথায় কতক মোট চাপাইয়া দিয়া, নিজেরাও কতক কতক ঘাড়ে করিয়া পদব্রজে গামারিয়া অভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিলাম। গাড়ী ও গাড়োয়ানকে সেই স্থান হইতে বিদায় দিলাম।

একটু অগ্রসর হইয়াই দেখিলাম, মাইল ষ্টোনে ১৬ মাইল লেখা আছে। অর্থাৎ এখনও ৫ মাইল চলিলে, গামারিয়ায় পৌছিব। সে দিন আকাশ বেশ নির্ম্মল; আকাশে মেঘের কণামাত্রও দৃষ্ট হয় না; পাহাড়িয়া সূর্য্য সে দিন তীব্র তেজ বর্ষণ করিতেছিলেন। বেলা প্রায় ২টা। তথনও পর্য্যন্ত পেটে কিছুই পড়ে নাই; ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে পথ চলিতে লাগিলাম। ঝাড়া হাত পা হইলে, পথ হাঁটিতে অত কষ্ট হইত না; ঘাড়ে আমাদের এক একটা বোঝা। অতি কষ্টে পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলাম। পাহাড় পর্ব্বত, বন জঙ্গল, নদী ঝরনা, এবার—একেবারে অসহ্য চক্ষুশূল বোধ হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে বনের ভিতর, রাস্তার ধারে থোলো থোলো বুনো ফল পাকিয়া আছে। মনে করিলাম সেই ফল থাইয়া Breakfast করি। ক্ষুধা অসহ্য হইলেও সেই ফল গ্রহণ করিতে সাহস হইল না। এই ভাবে আড়াই ক্রোশ পথ চলিয়া প্রায় চারিটার সময় গামারিয়ার বাঙ্গালায় আসিয়া উপস্থিত। দেখিলাম জেলার বাঙ্গালি ডিষ্ট্রীক্ট এঞ্জিনিয়ারের পূর্ব্বেই তথায় আগমন হইয়াছে। এঞ্জিনিয়ারের চাকর বামুন ছাড়া বাঙ্গালায় অপর কেহ ছিল না। বাঙ্গালার দাওয়ায় উভয়ে আক্রান্ত হইয়া শুইয়া পড়িলাম;—একখানা কম্বল পাতিয়া শুইবারও শক্তি নাই। এমন সময় এঞ্জিনিয়ার বাবুর বাঙ্গালায় আবির্ভাব হইল। তিনি আসিয়াই আমাদিগকে জেরা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই বাঙ্গালায় থাকিবার জন্য কোন লিখিত হুকুম আমাদের নিকট আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার কথায় বু'ঝলাম, লোকটা আমাদিগকে তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। আমরা ভুলিবার ছেলে নয়; তাহার চেষ্টা বৃথা হইল। লোকটা আমাদের সম্মুখে বসিয়া ধূম পান করিতে লাগিল; আমাদের তথন পর্য্যন্ত আহারাদি হয় নাই শুনিল, তবুও তাহার কোনরূপ ভাব বৈলক্ষণ্য দেখিলাম না। বুঝিলাম ভদ্রসন্তান কুলি খাটাইতে খাটাইতে, ভদ্রতা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে।

আমরা বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময় সেই স্থানের Forest বিভাগের Deputy Ranger, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মজুমদার মহাশয়, এঞ্জিনিয়ারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাঙ্গালায় আসিলেন। তিনি আসিয়া আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া, ২।১টা কথার পরেই, তথনও আমাদের আহারাদি

হয় নাই শুনিয়া, বাড়ী হইতে চাল ও ডাল আনাইয়া দিলেন। তাঁহার মুখে শুনিলাম যে সেই গ্রামে এক খানি মুদিখানার দোকানও আছে। এঞ্জিনিয়ার কষ্ট করিয়া এ কথাটীও আমাদের বলে নাই। সন্ধ্যার প্রাকালে, Breakfast করিলাম। ত্রৈলোক্য বাবু বেশ অমায়িক লোক। বিদেশে আসিয়া তাঁহার নিকট হইতে এতটা যত্ন পাইব, আমরা কখনও আশা করি নাই। এই বৈচিত্র্যময় সংসারে সকল প্রকারের মনুষ্যই দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে এঞ্জিনিয়ারের দলের লোকও অনেক, আবার অনেক ত্রৈলোক্য বাবুও দেখিতে পাওয়া যায়। অন্ধকার আছে বলিয়াই আলোক বুঝিতে পারি, দুঃখ আছে বলিয়াই সুখ উপভোগ করিতে পারি।

পরদিন মধ্যাহ্নে আহারাদি করিয়া, আর একখানি গো-শকট ভাড়া করিয়া, গামারিয়া হইতে ৫॥ ক্রোশ দূরে জগন্নাথপুরে যাইবার জন্য রওনা হইলাম। জগন্নাথপুর যাইতে পথে ৪টী নদী পাওয়া যায়। এই নদীগুলির উপর সেতু নাই। আমরা পথিমধ্যে বেশ বৃষ্টি পাইলাম। যাহা হউক এবার গাড়ীখানি বেশ চলিতেছে, আমরা সন্ধ্যার সময় ভিজিতে ভিজিতে জগন্নাথপুরের বাঙ্গালায় পৌঁছিলাম। বি, বোড়ুয়া কোম্পানীর দুই জন কর্ম্মচারী, তাঁহাদের কর্ম্মস্থান কেঞ্জোড় যাইবার পথে, এই বাঙ্গালায় আসিয়া উঠিয়াছেন। এখানে আসিয়া আমরা আর একজন ত্রৈলোক্য বাবু পাইলাম। ইনিও এই স্থানের Deputy Ranger, নাম শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু। কয়দিন তাঁহার নিকট অতি যত্নে ছিলাম। তিনি আমাদিগকে ছাড়িতে চাহেন না। জঙ্গলের মধ্যেও এইরূপ উদার লোকের সাক্ষাৎ পাইব, ইহা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই। জগন্নাথপুর একখানি গণ্ডগ্রাম। গ্রামে প্রায় ২০০।৩০০ ঘর বসতি। কয়েকখানি মুদির দোকান ও দুইখানি খাবারের দোকান আছে। এখানে একটী Middle Vernacular স্কুল ও একটী পোষ্ট অফিস আছে। তাই তোমাকে পত্র লিখিতে পারিতেছি। বেশ উচ্চ বিস্তৃত সমতল ভূমির উপর এই গ্রাম অবস্থিত। চাঁইবাসা হইতে এই স্থানের জল বায়ু ভাল।

আজ কয়দিন কেবল কোলদিগের সহিত ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। লোকগুলা অত্যন্ত গরিব। বৎসরের মধ্যে ৯।১০ মাসও ইহারা এক বেলা পেট

ভরিয়া খাইতে পায় না। অনেক সময় ইহারা অশ্বত্থ প্রভৃতি গাছের কচি পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করে। যখন বটফল পাকে, তখন দুই মাস ইহারা কেবল বটফল খায়। ইহাদের দুর্দ্দশা দেখিলে প্রাণ ফাটিয়া যায়। চাল এ দেশে অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। অধিবাসীরা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, অথচ প্রতি বৎসর রাশিকৃত চাল বিদেশে রপ্তানি হইতেছে। পুরুষদিগের শরীর বাঙ্গালী অপেক্ষাও ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কচিৎ দুই একটা বলিষ্ঠ কোল দেখিতে পাওয়া যায়। "হাড়িয়া" নামে পচাই খাইয়া ইহারা অনেক সময় নেশায় ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া পড়িয়া থাকে। হাড়িয়া কোলেদের Food & Drink উভয়ই। এই নেশায় ইহাদিগকে মাটি করিতেছে। নিজের গ্রাম ও তাহার গ্রামের নিকটে যে গ্রামে হাট বসে, এই দুই স্থান ছাড়া ইহারা সংসারের কোন খবরই রাখে না। তবে আজ কাল চাঁইবাসার কথা অনেকের কাণে ঢুকিয়াছে। লোকগুলি অত্যন্ত নিরীহ ও সরলপ্রকৃতি বিশিষ্ট। চুরি, ডাকাতি, এ দেশে একেবারেই হয় না। কৃষিকার্য্য ইহারা প্রায় কিছুই জানে না। দেশে অত্যন্ত জলাভাব, ছেঁচ দিয়া শস্য রক্ষা করিবার কোন উপায় নাই। অনাবৃষ্টি হইলে, দেবতার নিকট মুরগি বলি দিয়া, তাঁহার কোপ উপশমিত করিবার চেষ্টা করে। তাহাতেও বৃষ্টি না হইলে, গাছের পাতা, বুনো গুল্ম খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। ইহাদের অবস্থা দেখিয়া আমাদের মনে কষ্ট হইলেও, ইহারা কিন্তু কষ্টকে কষ্ট বলিয়া মনে করে না; ইহারা একপ্রকার বেশ সুখেই আছে।

আজ ৪।৫ দিন জগন্নাথপুরে আছি। সেই যে শনিবারে বৃষ্টি নামিয়াছে, আজও বৃষ্টি ছাড়ে নাই; অনবরত প্রবল ধারায় জল পড়িতেছে। পথের নদীগুলি বর্ষা সমাগমে ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। আবার সেই নদীগুলির উৎপত্তি স্থান, এই স্থানের অতি নিকটে। পাহাড় হইতে গভীর গর্জ্জন করিয়া ভীমবেগে নদীতে জল নামিতেছে। কাহার সাধ্য পার হয়। নদীতে জল কমিলে, আমরা এখান হইতে ডেরা তুলিব। এ কয়দিন এখান হইতে ডাক যাইতেছে না।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

ত্রিগুণ ও ত্রিদোষ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্লেষ্মা—শ্বেতবর্ণ জলীয় দ্রব্য বিশেষ। ইহা আস্বাদনে মধুর রস। কিন্তু বিকৃত হইলে লবণাস্বাদ হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদবেত্তারা—শ্লেষ্মার যেরূপ স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন, পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা লেখা যাইতেছে।

শ্লেষ্মার স্বরূপ।

শ্লেষ্মা—গুরু, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল, শীতল ও মৃদু। গুরুতা গুণ আছে বলিয়া—শ্লেষ্মা আমাদের শরীরের ভার রক্ষা করিতে সক্ষম হয়। ইহার স্নেহ গুণে দেহ স্নিগ্ধ থাকে। আমাদের সন্ধি সকল—শ্লেষ্মার পিচ্ছিলতা গুণেই আটকাইয়া থাকে। এই জন্যই আমাদের অস্থি হইতে মাংস খসিয়া যায় না। মাংসপেশীতে শ্লেষ্মার পিচ্ছিলতা আছে বলিয়া, উহারা শরীরের বাঁধুনী দৃঢ় রাখিতে পারে। শ্লেষ্মা—তমোগুণাত্মক, আলস্য ও নিদ্রা ইহার সহচর। তমোগুণের সংহার শক্তিও শ্লেষ্মায় বর্ত্তমান। শ্লেষ্মার প্রকোপ না হইলে মানুষ মরে না।

শ্লেষ্মা অপ্রকৃত অবস্থায় যখন স্বীয় গুরুত্ব গুণে বায়ুর স্রোত সকল অত্যন্ত রুদ্ধ করিয়া ফেলে, এবং শৈত্যদ্বারা যখন পিত্তের তাপ অত্যন্ত কমাইয়া দেয়, তখন মৃত্যু মানুষের নিকটবর্ত্তী হয়।

শ্লেষ্মাও নামভেদে স্থানভেদে এবং কার্য্যভেদে পাঁচ প্রকার বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ঐ পঞ্চ শ্লেষ্মা—আমাশয়, হৃদয়, কণ্ঠ, মস্তক ও সন্ধিস্থান যথাক্রমে শরীরের এই পঞ্চ স্থান আশ্রয় করিয়া থাকে। আমাশয়স্থ শ্লেষ্মার নাম "ক্লেদক"। ভক্ষিত দ্রব্য আমাশয়ে আসিয়া পড়িলে, ক্লেদক শ্লেষ্মাই

ক্লেদক শ্লেষ্মার স্থান ও কার্য্য।

তাহার জমাট ভাঙ্গিয়া দেয় এবং নিজ রসে তাহা সিক্ত করিয়া ফেলে। শ্লেষ্মাকর্ত্তৃক ভুক্ত দ্রব্যের এরূপ অবস্থা না হইলে, পিত্তাগ্নি তাহাকে পরিপাক করিতে পারিত না। সুশ্রুত এই শ্লেষ্মা ও পিত্তের ক্রিয়া

সম্বন্ধে একটী সুন্দর উপমা দিয়াছেন। তিনি বলেন—"চন্দ্র যেমন সূর্য্য ক্রিয়ার আধার, শ্লেষ্মা তেমনি পিত্ত ক্রিয়ার আধার।" কথাটা একটু ভাল করিয়া বুঝা যাউক। পুরাকালে—আর্য্য জ্যোতিষিগণ চন্দ্রকে সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যস্থিত বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। * সেই উপমান অনুসারেই সুশ্রুত শ্লেষ্মাকে পিত্তাগ্নি এবং ভুক্তদ্রব্যের মধ্যস্থিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

চন্দ্র এই বিশাল জগৎকে অমৃত রসে আপ্লুত করিয়া রাখিয়াছেন, সূর্য্য স্বীয় কিরণ দ্বারা সেই রস উত্তাপিত করিয়া সমস্ত পদার্থকে পরিপাক করিতেছেন। সুতরাং চন্দ্র, সূর্য্য ক্রিয়ার আধার; চন্দ্র না থাকিলে—পদার্থের পরিপাক হইত না, সূর্য্যের তীক্ষ্ণ কিরণে সমস্তই দগ্ধ হইয়া যাইত।

পিত্তও সেইরূপ—শ্লেষ্মাকে উত্তপ্ত করিয়া ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাকে সহায়তা করে। শ্লেষ্মাদ্বারা আচ্ছন্ন না থাকিলে, ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হইত না; পিত্তের উত্তাপে একেবারেই দগ্ধ হইয়া যাইত। এস্থলে উপমাণ এবং উপমেয়ের সম্বন্ধ বিবেচনা করিতে গেলে শ্লেষ্মাকে পিত্তক্রিয়ার আধার বলাই সম্ভব।

বক্ষস্থলস্থিত "অবলম্বক" নামক শ্লেষ্মা—বাহুদ্বয় ও মস্তকের সন্ধিদেশ দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া থাকে। "রসন নামক শ্লেষ্মা—কণ্ঠ দেশ অধিকার করিয়া জিহ্বাকে সর্ব্বদাই সিক্ত করিয়া রাখে, ইহার সাহায্যেই আমরা মধুরাদি ষড়বিধ রসের আস্বাদন বুঝিতে পারি। "স্নেহন" শ্লেষ্মা মস্তকে থাকে; আমরা যে সকল তৈলাদি মর্দ্দন করি—তাহার দ্বারা স্নিগ্ধ হইয়া "স্নেহন" শ্লেষ্মা আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয়কে সাহায্য করে। আর আমাদের সন্ধিস্থানে যে "শ্লেষ্মন" নামক শ্লেষ্মা আছে, তাহার সাহায্যে আমাদের সন্ধি সকল আটকাইয়া থাকে।

অবলম্বক, রসন, স্নেহন ও শ্লেষ্মণ শ্লেষ্মার স্থান এবং কার্য্য।

শ্লেষ্মা প্রকৃতিস্থ থাকিলে, আমাদের দেহ স্নিগ্ধ, সুদৃঢ় ও সবল থাকে। শ্লেষ্মবাহিনী শিরাও—আমাদের শরীরে ১৭৫টী আছে। এই সকল শিরা-গুলি—স্পর্শে শীতল, গৌরবর্ণ বিশিষ্ট এবং স্থির।

আলিঙ্গণার্থক "শ্লিষ" ধাতুর উত্তর মন্ প্রত্যয় করিয়া শ্লেষ্মা শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে।

---

* ছাদকো ভাস্করস্যেন্দুরধঃস্থো ঘনবদ্ভবেৎ।

এতক্ষণে বায়ু পিত্ত এবং কফের কার্য্য আমরা কতকটা আয়ত্ত করিতে পারিলাম। আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ কেন যে এই বায়ু পিত্ত কফের সাম্যভাবকে স্বাস্থ্য বলিয়াছেন, তাহাও কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিলাম।

বায়ু, পিত্ত, কফ কুপিত হইলে—শীঘ্রই রসরক্তাদি সপ্ত ধাতুকেই দূষিত করিয়া ফেলে, এই জন্যই আয়ুর্ব্বেদে ইহারা "ত্রিদোষ" নামে অভিহিত হইয়াছে। আমরা যে, কোনও মনুষ্যকে কৃশ দেখি, কাহাকেও বা স্থূল দেখি, এ সবও এই বায়ু পিত্ত কফের কার্য্য। প্রাণী মাত্রেই—এই ত্রিদোষের মধ্যে যে কোনও একটার প্রকৃতি লইয়া ভূমিষ্ঠ হয়। পিতা মাতার শুক্র শোণিতে যে' যে' দোষের আধিক্য থাকে গর্ভস্থ শিশুর প্রকৃতিও সেই দোষের অনুরূপ হইয়া থাকে। এই জন্যই মনুষ্যগণ জন্ম হইতেই কেহ বাত প্রকৃতি, কেহ পিত্ত প্রকৃতি, কেহ বা কফ প্রকৃতির হইয়া থাকে। এইরূপে বাতাদি দোষ, পৃথক ভাবে বা দুইটী অথবা সমস্ত একত্র হইয়া সপ্ত প্রকার প্রকৃতি জন্মায়। যথা—(১) বাতপ্রকৃতি, (২) পিত্তপ্রকৃতি, (৩) শ্লেষ্মপ্রকৃতি, (৪) বাতপিত্তপ্রকৃতি, (৫) বাতশ্লেষ্মপ্রকৃতি, (৬) পিত্তশ্লেষ্ম প্রকৃতি, এবং (৭) বাতপিত্তশ্লেষ্ম প্রকৃতি। যাহার শরীরে বায়ুর প্রাধান্য লক্ষিত হইবে, সে বাতপ্রকৃতি, এইরূপ পিত্তের প্রাধান্যে পিত্তপ্রকৃতি, শ্লেষ্মার প্রাধান্যে শ্লেষ্মপ্রকৃতি, উভয় দোষের প্রাধান্যে দ্বন্দ্বজপ্রকৃতি ইত্যাদি বুঝিতে হইবে।

বায়ুর রুক্ষগুণ আছে বলিয়া—বায়ুপ্রকৃতির মনুষ্যগণের শরীর অত্যন্ত শীর্ণ এবং শিরাজালে পরিপূর্ণ হয়। ইহাদের হস্ত পদ ও দেহ রুক্ষ এবং ফাটা ফাটা হইয়া থাকে। ইহারা যখন চলিয়া যায়, তখন পা মট মট করিতে থাকে। বাতপ্রকৃতির পুরুষগণ স্ত্রীলোকের অত্যন্ত অপ্রিয় হয়।

বাতপ্রকৃতিক মনুষ্য।

বায়ুর লঘুতা হেতু, ইহারা অল্পবল, অল্পায়ু এবং অল্প শুক্রবিশিষ্ট হইয়া থাকে। বায়ুর চাঞ্চল্যে বাতপ্রকৃতির মনুষ্যের বুদ্ধি, দৃষ্টিশক্তি, কার্য্য, গতিশক্তি এবং মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়। ইহারা জিতেন্দ্রিয় হয় না, এক স্থানে থাকিতে ভালবাসে না, কাহারও সহিত বন্ধুত্ব রাখিতে পারে না—কাহাকে বিশ্বাস করে না, নিজেও কাহারও বিশ্বাসের পাত্র হয় না। ইহারা অনেক কথা

কয়, কোনও বিষয়ের দৃঢ়তা রাখিতে জানে না। বায়ুর শীঘ্রকারিতা গুণে, ইহাদের মনে শীঘ্রই দুঃখ, অভিমান, উৎসাহ, ক্রোধ, চিন্তা, ভয় এবং ইচ্ছা উপস্থিত হয়। ইহারা শীঘ্র শিক্ষা করে, আবার শীঘ্রই ভুলিয়া গিয়া থাকে। বায়ু শীতল, এই জন্য বাতপ্রকৃতির পুরুষেরা—শীত সহ্য করিতে পারে না, অত্যন্ত কম্প অনুভব করে, উষ্ণ দ্রব্য ভালবাসে।

মিথ্যাবাদীত্ব, অভিমানিতা, নাস্তিকতা এবং বিলাস-প্রিয়তা প্রভৃতি রাজসিক ও তামসিক লক্ষণ, বাতপ্রকৃতির মনুষ্যে লক্ষিত হয়। কোনও কোনও বৈদ্যকাচার্য্য বলেন—বাতপ্রকৃতির পুরুষ চোর হয় এবং সর্ব্বদাই পাপ কর্ম্মে রত থাকে। ইহাদের গলার আওয়াজ অত্যন্ত ক্ষীণ, কর্কশ ও ভাঙ্গা ভাঙ্গা হইয়া থাকে। ইহারা কাহারও প্রতি সদ্ব্যবহার করে না, দরিদ্র হয়, নিদ্রাকালে উড়িয়া যাইতেছি এইরূপ স্বপ্ন দেখে। বাতপ্রকৃতির পুরুষ অতি নিকৃষ্ট, ইহারা অকৃতজ্ঞ, দুষ্টবুদ্ধি, বহুভাষী, কামুক, অহঙ্কারী এবং লোকনিন্দুক হইয়া থাকে।

পিত্ত উষ্ণ বলিয়া, পিত্তপ্রকৃতি মনুষ্য উষ্ণ সহ্য করিতে পারে না, ইহাদের দেহ স্বভাবতই উষ্ণ স্পর্শ হইয়া থাকে। ইহারা নিদ্রাবস্থায় অগ্নি, বিদ্যুৎ ও উল্কা প্রভৃতি তৈজস পদার্থ স্বপ্নে নিরীক্ষণ করে। রৌদ্র লাগিলে কিম্বা মদ্যপান করিলে ইহাদের চক্ষু লালবর্ণ হইয়া উঠে। শীতল দ্রব্য,

পিত্তপ্রকৃতিক।

পুষ্পমালা, চন্দনাদি সুগন্ধি দ্রব্য এবং স্ত্রী- লোককে ইহারা বড় ভালবাসে। পিত্তের তীক্ষ্ণতায়—পিত্তপ্রকৃতির মনুষ্যগণ তীক্ষ্ণ পরাক্রমী, সাহসী এবং অভিমানী হয়। ইহাদের বুদ্ধি, স্মরণশক্তি, পরিপাকশক্তি সমস্তই অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। ইহারা সহসা নত হইতে চাহে না, শরণাগতকে পরিত্যাগ করে না, ক্রুদ্ধ হইলে কাহারও ক্ষতি না করিয়া ক্ষান্ত হয় না। ভয়ঙ্কর তৃষ্ণার্ত্ত এবং অত্যন্ত পেটুক হয়। ইহাদের চুল শীঘ্রই পাকিয়া যায়, মাথায় টাক পড়ে, শরীরে অত্যন্ত তিলচিহ্ন থাকে, ক্ষুধা হয় এবং রোগের যন্ত্রণা একেবারেই সহিতে পারে না।

পিত্ত পূতিগন্ধময়, পিত্তপ্রকৃতির পুরুষদেরও—গাত্রে, মুখে এবং বগলে ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ হয়। পিত্তের তরলতায় পিত্তল পুরুষের শরীর শিথিলভাবাপন্ন

হইয়া থাকে। ইহাদের মাংস শীঘ্রই লোল হইয়া যায়; পিত্তের সারকত্তাগুণ থাকায় ইহাদের মল মূত্র এবং ঘর্ম্ম প্রচুর পরিমাণে নির্গত হয়।

কোনও কোনও গ্রন্থকার বলেন—পিত্তপ্রকৃতির পুরুষ মধ্যমায়ুবিশিষ্ট আশ্রিত বৎসল, তেজস্বী, যোদ্ধা, সঙ্গতবক্তা এবং নিঃশঙ্ক হইয়া থাকে। ইহাদের শরীর প্রায়ই গৌরবর্ণবিশিষ্ট এবং হস্ত পদ ও চক্ষু তাম্রাভ হয়।

পুরুষের মধ্যে শ্লেষ্মপ্রকৃতির পুরুষই উৎকৃষ্ট। কফের স্নিগ্ধশক্তি থাকায়, কফপ্রকৃতির মানুষেরা—শ্রীমান, স্নিগ্ধাঙ্গ এবং প্রিয়দর্শন হইয়া থাকে। ইহাদের বক্ষঃস্থল বিশাল, চুল ঘন এবং বাহু দীর্ঘ হয়। কফের গুরুত্বগুণে ইহারা স্থূলশরীর বিশিষ্ট, ধীরগতি এবং অত্যন্ত বলবান হইয়া থাকে। ইহাদের স্বভাব গম্ভীর হয়। শ্লেষ্মার পিচ্ছিলতাগুণ থাকায়, শ্লেষ্মপ্রকৃতির পুরুষ—বিলম্বে বুঝিতে পারে, কিন্তু চির দিন মনে করিয়া রাখিতে পারে। ইহাদের সন্ধি সকল সুদৃঢ় এবং অস্থি সকল গূঢ়ভাবে থাকে অর্থাৎ বাহির হইতে দেখা যায় না। ইহারা ক্ষুধা তৃষ্ণা ও ক্লেশে কাতর হয় না। ইহাদের মনে দুঃখ এবং ক্ষোভাদি বিকার বহু বিলম্বে উদিত হইয়া থাকে। শ্লেষ্মার মৃদুতায় ইহারা অল্পভাষী এবং অল্প ক্রোধী হয়। শ্লেষ্মার মাধুর্য্যগুণে শ্লেষ্মপ্রকৃতির লোকেরা—অধিক শুক্রবিশিষ্ট, অত্যন্ত রমণেচ্ছু, নারীজাতির প্রিয় এবং সরল চিত্ত হইয়া থাকে। শ্লেষ্মায় তমোগুণ অধিক থাকায়, শ্লেষ্মপ্রকৃতির পুরুষ, অত্যন্ত নিদ্রাশীল, আলস্যযুক্ত, অনুযোগী এবং দীর্ঘসূত্রী (কুড়ে) হয়। দয়া, কৃতজ্ঞতা, আশ্রিত বাৎসল্য, ভক্তি, পরলোকাদিতে শ্রদ্ধা, সদসদ্বিবেচনা, বিনয়, অস্পৃহা প্রভৃতি সাত্ত্বিকগুণ, শ্লেষ্মপ্রকৃতি পুরুষের সহচর। ইহাদের বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী, শত্রুতা—প্রচ্ছন্ন এবং মতি অচঞ্চল হইয়া থাকে। ইহারা নিষ্ঠুর কথা কহে না, নিষ্ঠুর কার্য্য করে না, অধিক আহার করে না, নির্লজ্জ হয় না, অসত্যের আদর করে না। শ্লেষ্মার শৈত্যগুণে, শ্লেষ্মল পুরুষেরা উষ্ণ ভালবাসে। ইহারা দাতা, দূরদর্শী এবং সৌভাগ্যশীল হইয়া থাকে। শ্লেষ্মা জলীয় পদার্থ বলিয়া শ্লেষ্মপ্রকৃতির পুরুষ উগ্র স্বভাব হয় না, ইহারা জলাশয়, জলচর, মেঘ অথবা পদ্ম প্রভৃতি জলীয় কুসুম স্বপ্নে সন্দর্শন করে।

শ্লেষ্মপ্রকৃতিক।

বাহুল্য ভয়ে মিশ্রপ্রকৃতির পুরুষের লক্ষণ উল্লিখিত হইল না। কৌতূহলী পাঠক, প্রয়োজন হইলে—স্বয়ংই মিলাইয়া দেখিতে পারিবেন। যাহার শরীরে দুই দোষের লক্ষণ লক্ষিত হইবে, সে মিশ্রপ্রকৃতি, এবং যে ব্যক্তি এই ত্রিদোষের লক্ষণে ভূষিত—তাহাকে সান্নিপাতিক প্রকৃতি বলিয়া স্থির করিবেন।

বাতপ্রকৃতির পুরুষেরা প্রায়ই বাতজ পীড়ায় পীড়িত হইয়া থাকে। এইরূপ পিত্তপ্রকৃতিক পুরুষের পিত্তজ ব্যাধি এবং কফজপ্রকৃতিতে কফজ-ব্যাধি হইতে দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে বায়ু পিত্ত ও কফ এই তিনটী সমানভাবে থাকিলে, আমাদের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু ইহাদের বৈষম্যভাব সকল রোগের কারণ। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে—বায়ু পিত্ত ও কফের তিনটী অবস্থা, এবং তিন প্রকার গতি উল্লিখিত হইয়াছে। সেই তিন প্রকার অবস্থা এই—

১। সমতা।

২। ক্ষয়।

৩। বৃদ্ধি।

যে অবস্থায় বায়ু পিত্ত কফ—সমানভাবে থাকিয়া, আমাদের শরীরকে রক্ষা করিয়া থাকে, উহাদের সেই অবস্থাকে "সমতা" বলা যায়। আর যে অবস্থায় উহাদের শক্তি অল্প হইয়া যায়, তাহার নাম ক্ষয়াবস্থা। বৃদ্ধির অবস্থায় ইহাদের কার্য্য অত্যন্ত অধিক হইয়া পড়ে। সুতরাং এই দুই অবস্থায়—ইহারা বহু রোগ উৎপাদন করিতে পারে।

জগতের সমস্ত পদার্থ যেমন সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের আশ্রয় ব্যতীত থাকিতে পারে না, জগতের সমস্ত ব্যাধিও সেইরূপ—বায়ু পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষের অবলম্বন ভিন্ন থাকে না।

বায়ু ক্ষয় হইলে—মন্দ চেষ্টতা, অল্পভাষিতা, অল্প হর্ষ এবং সংজ্ঞাহীনতা এই সকল উপসর্গ উপস্থিত হয়। পিত্ত ক্ষয় হইলে—শারীরিক তাপ কমিয়া যায়, অগ্নিমান্দ্য ঘটে, এবং শরীর বিবর্ণ হইয়া যায়। শ্লেষ্মারক্ষায়—দেহ রুক্ষ হয়, এবং অন্তর্দ্দাহ, আমাশয়, বক্ষঃ, কণ্ঠ ও মস্তকে শূন্যতা, সন্ধিবন্ধন শিথিল, অত্যন্ত পিপাসা, দুর্ব্বলতা, এবং নিদ্রানাশ হইয়া থাকে।

বায়ু বৃদ্ধি পাইলে—শরীরস্থ চর্ম্ম রুক্ষ ও কর্কশ হয়, ঘন ঘন গাত্রস্পন্দন হইতে থাকে, উষ্ণ দ্রব্য সেবনের প্রবল ইচ্ছা হয়, উৎসাহের অভাব ঘটে, নিদ্রা একেবারেই হয় না। মল অত্যন্ত কঠিন হইয়া যায় এবং শরীর কৃশ ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়।

পিত্ত বৃদ্ধি পাইলে—শরীর, নেত্র, মূত্র ও মল—পীতবর্ণ হইয়া যায়। দেহের তাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, ইন্দ্রিয় সকল দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, শীতল দ্রব্য সেবনে অত্যন্ত ইচ্ছা হয় এবং মূর্চ্ছা হইতে থাকে।

কফ বর্দ্ধিত হইলে—গাত্র স্তব্ধ (অসাড়) হয়, শারীরিক তাপের অভাবে শরীর অত্যন্ত শীতল হইয়া যায়, চর্ম্ম শুভ্রবর্ণ হয়, অবসন্নতা, তন্দ্রা এবং নিদ্রা অতিশয় রূপে হইয়া থাকে।

কিসে এই ত্রিদোষ কুপিত হয়, কিসেই বা উহারা শান্ত হয়, কুপিত হইলেই বা কি কি রোগ উৎপন্ন করিতে পারে, বারান্তরে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। শ্রীব্রজবল্লভ রায়।

নদীয়ায় যবনাধিকার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

হুসেন সাহের পরবর্ত্তীকালে সের সাহ নামক একজন দুর্দ্ধর্ষ আফগান প্রথমে বঙ্গদেশ পরে ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে হুমায়ুনকে পরাস্ত করিয়া দিল্লী অধিকার করেন। সের সাহ রাজকার্য্যে সুদক্ষ হইলেও অত্যন্ত হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন। এমন কি তাহাদের জাতি ধর্ম্ম হানিকর আইনাদি প্রচলন করিয়াছিলেন। এই সকল আইনের মধ্যে "হিন্দু প্রজা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কর দিতে অশক্ত হইলে মুসলমান শাসনকর্ত্তা ইচ্ছা করিলে তাহার মুখে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিতে পারিবেন, এবং ইসলাম ধর্ম্মের সমুজ্জ্বল মহিমা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত হিন্দু প্রজা ঘৃণা না করিয়া তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য, *

---

* When the collector of the Dewan asks them (the Hindus) to pay the tax, they should pay it with all humility and submission. If the collector wishes to spit into their mouth, they should open

ইত্যাদি আইন প্রচলন দ্বারা লক্ষ লক্ষ দরিদ্র হিন্দুর ধর্ম্মনাশ করিয়া মুসলমান করিয়া যান। ইহাই এতদঞ্চলে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান সংখ্যাধিক্যের প্রধান কারণ বলিয়া অনুমিত হয় †।

সের সাহের মৃত্যুর পর তদ্বংশীয় কয়েক জন গৌড়ে শাসনকর্ত্তা হন। রাজনীতিবেত্তা মোগল কুল-রবি সুচতুর আকবর সাহ সমগ্র হিন্দুস্থান করতলগত করিয়া সেনাপতি মুনিম খাঁকে এবং তোডরমল্লকে বাঙ্গালায়, পাঠান শাসনের মূলোচ্ছেদ করিতে প্রেরণ করেন। এই সময়ে গৌড়ে অত্যন্ত মারিভয় উপস্থিত হয়; লক্ষ লক্ষ লোক এই লোকক্ষয়কর ব্যাধির দারুণ কবলে কবলিত হওয়ায় প্রাচীন গৌড় একেবারে জনশূন্য হইয়া পড়ে। আকবরের সেনাপতি মুনিম খাঁও এখানে আসিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং আকবর সাহ তাঁহার স্থানে হুসেনকুলী খাঁ নামক একজন দক্ষ সেনাপতিকে ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে তোডরমল্লের সাহায্যার্থ প্রেরণ করেন। সুচতুর তোডরমল্ল দিল্লী হইতে সৈন্য সাহায্য প্রাপ্ত হইলে তাঁহার সৈন্যসংখ্যা আরও বৃদ্ধি করিবার মানসে বঙ্গদেশস্থ জমিদারবর্গের সহিত সখ্যতা স্থাপন করিতে চেষ্টা করেন। তাহার ফলে তদানীন্তন নদীয়ার অন্তর্গত চতুর্বেষ্টিত দুর্গস্বামী কায়স্থকুলভূষণ রাজা কাশীনাথ রায় তোডরমল্লের সহিত মিলিত হন এবং মোগলের পক্ষ হইয়া পাঠানদিগের সহিত যুদ্ধে অতুল বীরত্ব প্রদর্শন করেন। এই চতুর্বেষ্টিত দুর্গ এক্ষণে নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে, এবং সাধারণতঃ চৌবেড়িয়া নামে খ্যাত। ইহা বর্ত্তমান বেঙ্গল সেণ্ট্রাল রেল-

---

their mouths without the slightest fear of contamination so that the collector may do so. The object of such humiliation and spitting into their mouths is to prove the obedience of the infidel subjects under protection and promote, if possible, the glory of the Islam—the true religion and to show contempt to false religions

Von. Noha's Akbar.

এই বর্ব্বরোচিত আইন মহামতি আকবরের সময় রহিত হয়।

† The existence of a large Musalman population in the district (Nadiya) is accounted for by wholesale forcible conversions at a period anterior to the Moghul Emperors during the Afghan supremacy.

Hunter's. S. Account Vol. II p. 51.

ওয়ের গোপালনগর ষ্টেশন হইতে ৭ সাত মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। * চতুর্বেষ্টিত দুর্গ যখন প্রাসাদ, পরিখা ও অগণিত জনপূর্ণ ছিল, তখন সন্নিহিত বনগ্রাম ও বিশেষ সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল। পূর্ব্বে চতুর্বেষ্টিতদুর্গ ও রাজপ্রাসাদের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া পুণ্যসলিলা যমুনা প্রবল বেগে প্রবাহিতা ছিলেন; সেই দুর্গপাদচারিণী বিশালকায়া যমুনাও এক্ষণে ক্ষীণ রজত রেখার ন্যায় অতি মৃদু গতিতে প্রবাহিতা। কোথাও আবার সেই সূক্ষ্ম প্রবাহেরও অভাব দাঁড়াইয়াছে। গুণগ্রাহী বাদসাহ আকবর সেনাপতি তোডরমল্লের নিকট বঙ্গবীর রাজা কাশীনাথের অসাধারণ যুদ্ধকৌশল ও অপূর্ব্ব বীরত্ব কাহিনী শ্রবণ করিয়া এবং পাটনা অবরোধের সময় স্বচক্ষে উহা প্রত্যক্ষ করিয়া পাটনা অধিকারের পর প্রকাশ্য দরবারে রাজা কাশীনাথকে সমরসিংহ এই গৌরব জনক উপাধি ও বাদসাহী ঝাণ্ডা, নাগরা, পাল্কী ও অশ্ব গজাদি প্রদান পূর্ব্বক নানারূপে সম্মানিত করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই যখন কুলী খাঁ ও তোডরমল্লের সম্মিলিত বিপুল মোগলবাহিনী পলায়নপর শেষ পাঠান নরপতি দায়ুদ খাঁর পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল তখনও রাজা সমরসিংহ সানন্দচিত্তে সর্ব্ব প্রথমে তোডরমল্লের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং নিজের স্বাভাবিক বীরত্ব ও সাহস প্রদর্শন করিয়া বাঙ্গালা হইতে পাঠান রাজ্য উচ্ছেদের ও মোগল রাজত্ব সংস্থাপনের বিশেষ সহায়তা

* পণ্ডিতাগ্রগণ্য সুলেখক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, আই, সি, এস্, মহোদয় যখন বনগ্রামের সব ডিভিসনাল অফিসার ছিলেন, তখন বহু অনুসন্ধানে এই চতুর্বেষ্টিত দুর্গস্বামীর বীরত্বকাহিনী সংগ্রহ করিয়া তাহাই অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার সুবিখ্যাত উপন্যাস "বঙ্গবিজেতা" প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমানকালে চৌবেড়িয়াতে পূর্ব্ব সমৃদ্ধির কোনরূপ চিহ্নমাত্র বিদ্যমান নাই। চতুর্বেষ্টিত স্থানটীর মধ্যে এক্ষণে রাজার বাগান, ফুলবাড়ী ও সেহালাপাড়া নামে তিনটী ম্যালেরিয়া পীড়িত ক্ষুদ্র পল্লী বিদ্যমান আছে। তাহারা তাহাদের নামের সহিত যেন একটা পূর্ব্বস্মৃতির আভাসমাত্র বহন করিতেছে। এই চতুর্বেষ্টিত দুর্গ এখানে সাধারণতঃ রাজা সতীশের দুর্গ বলিয়া খ্যাত। সতীশ ইছাপুরের জমিদার ও সমরসিংহের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার বংশ অদ্যাপি ইছাপুরে বিদ্যমান। ইছাপুর চৌবেড়িয়া হইতে ৫ মাইল দূরবর্ত্তী। এই চৌবেড়িয়া সুপ্রসিদ্ধ নীলদর্পণ প্রণেতা ৺দীনবন্ধু মিত্র রায় বাহাদুরের জন্মস্থান।

করেন। মহাবীর্য্যশালী রাজা সমরসিংহের শেষ জীবন অতি শোকাবহ। বঙ্গদেশ সম্পূর্ণরূপে বিজিত হইলে কুলী খাঁর উপর কিয়দ্দিবসের নিমিত্ত বঙ্গের শাসন ভার অর্পণ করিয়া রাজা তোডরমল্ল সম্রাট আক্‌বরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিল্লী গমন করেন। এই সুযোগে সমরসিংহের কতিপয় কৃতঘ্ন কর্ম্মচারী সমরসিংহের সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য এক ভীষণ ষড়যন্ত্র করে। রাজবিদ্রোহ-অপবাদে তদানীন্তন বঙ্গের সুবেদারের অদ্ভুত বিচারে সমরসিংহের শিরশ্ছেদন হইয়াছিল। কিছুদিন পরে তোডরমল্ল বঙ্গের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া বাঙ্গালায় প্রত্যাগমন করিলে সমরসিংহের মহিষী তাঁহার নিকট বিচার প্রার্থিনী হন। রাজা তোডরমল্ল, চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গে বঙ্গবিজয়ের ঘোষণাস্বরূপ এক বিরাট দরবার আহ্বান করেন এবং সমর-সিংহের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীগণের প্রাণ দণ্ডের আদেশ দেন। এই দরবারে সমস্ত বঙ্গদেশ মোগল সম্রাটের শাসনাধীন বলিয়া ঘোষিত হয়। এত দিনে বাঙ্গালায় স্বাধীন পাঠান রাজত্ব শেষ হইয়া বাঙ্গালা প্রত্যক্ষভাবে মোগল-সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। রাজা তোডরমল্লই বাঙ্গালার মোগল সম্রাটের প্রথম প্রতিনিধি। তিনি সমগ্র বঙ্গদেশ জরীপ জমাবন্দী করিয়া রাজস্বের সু-বন্দোবস্ত করেন ও আশ্‌লী জমানুসারে বঙ্গদেশকে ১৯টী সরকারে ও ৬৮৯টী মহলে বিভক্ত করেন। তোডরমল্লের আশ্‌লী জমায় ১০,৬৯৩,০৬৭৲ আক্‌বরসাহী টাকা রাজস্ব আদায় হইত। পূর্ব্বোক্ত ১৯টী সরকারের মধ্যে ১১টী গঙ্গার উত্তর ও পূর্ব্বে ৮টী গঙ্গার পশ্চিম এবং ভাগীরথীর সঙ্গমস্থানের নিকট অবস্থিত, তন্মধ্যে সরকার সপ্তগ্রাম ১টী। জেলা নদীয়া তখন সরকার সপ্তগ্রামের অধীন ছিল। এই সপ্তগ্রাম সরকার তখন বহুদূর বিস্তৃত ছিল; ইহার উত্তর সীমা পলাশী, দক্ষিণ সীমা হাতিয়াগড় এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম কপাতক (কপোতাক্ষ নদী ?) হইতে ভাগীরথীর উত্তর তীর লইয়া বিস্তৃত ছিল। ইহার অধিকাংশ মহল বর্ত্তমান নদীয়া ও ২৪ পরগণার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে এই সুবিস্তীর্ণ সরকারের বার্ষিক রাজস্ব ছিল ৪১৮,১১৮৲ আক্‌বরী টাকা, বন্দর ও হাটের আয় ছিল ৩০,৩০০৲ টাকা, ১৭:৮ খৃষ্টাব্দে আয় ২৯৭,৭৪১৲ টাকা বলিয়া উল্লিখিত আছে *।

---

* Grant's Analysis of the Bengal Finances.

পাঠানগণ বিজিত হইলেও তাহাদিগকে মোগলগণের করতলগত রাখা দুঃসাধ্য হইল। সুযোগ পাইলেই বাঙ্গালার ভূস্বামীগণ দিল্লীশ্বরের অধীনতা অস্বীকার করিতেন। তাঁহারা নামে দিল্লীশ্বরের অধীন হইলেও কার্য্যত তাঁহারাই দেশের প্রকৃত রাজা ছিলেন। এইরূপে স্বাধীন ভূস্বামীগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহাদের মধ্যে দ্বাদশ জন প্রধান ছিলেন, তাঁহারা সাধারণতঃ দ্বাদশ ভৌমিক নামে খ্যাত। এই সকল স্বাধীন ভূস্বামী-গণের মধ্যে যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যই সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। মোগলগণ কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ বিজিত হইলে পাঠান রাজের একজন বাঙ্গালী কর্ম্মচারী বহু পাঠান সর্দ্দারের ও স্বীয় ধন রত্নাদি সহ সুন্দরবনের মধ্যে লুক্কায়িত থাকেন; তাঁহার নাম বিক্রমাদিত্য। তিনি এই জঙ্গলাকীর্ণ দুর্গম প্রদেশে ক্রমে বল সঞ্চয় করিয়া তদানীন্তন ভূস্বামীগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করেন। সুবিখ্যাত পদকর্ত্তা বসন্ত রায় ইঁহার খুল্লতাতপুত্র এবং বঙ্গের শেষ বীর—বীরচূড়ামণি প্রতাপাদিত্য ইঁহার পুত্র। এই প্রতাপাদিত্য আকবরের শেষ জীবনে তাঁহার অতি দুদ্ধর্ষ ও দুর্দ্দমনীয় শত্রু হইয়া উঠেন। তিনি চট্টগ্রামের ও আরাকানের রডা-প্রমুখ পর্ত্তুগীজদিগকে আপনার গোলন্দাজ সৈন্য মধ্যে নিযুক্ত করিয়া পুরী হইতে নোয়াখালি পর্য্যন্ত সমগ্র দেশ অধি-কার করেন। নদীয়ার দক্ষিণ অংশ কাঞ্চননগর বর্ত্তমান কাঁচড়াপাড়া এবং জগদ্দল প্রভৃতি স্থানও তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। এখনও জগদ্দলে তাঁহার গড় ও প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে ও রাজার পুকুর নামে পুষ্করিণী তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এতদ্ব্যতীত তাৎ-কালিক নদীয়ার অপরাপর স্থানেও তাঁহার অধিকারের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে প্রতাপের রাজ্যলাভের পূর্ব্বে হইতেই কুশদহের অন্তর্গত জলেশ্বর ও ইছাপুরে কাশীনাথ রায় নামে একজন ধনশালী ব্যক্তি বাস করিতেন। নদীয়া প্রভৃতি কয়েকখানি পরগণা ইঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর ইছাপুরের চৌধুরীগণের পূর্ব্বপুরুষ ও খড়দহ মেলের সিদ্ধান্তী থাকের রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ সেই জমিদারীর অধিকাংশ ভোগ করিতেছিলেন। প্রতাপ তাঁহাদের নিকট কর প্রার্থনা করিলে সিদ্ধান্ত-বাগীশ দিতে অস্বীকার করায় প্রতাপ তাঁহাকে শাসন করিবার

মানসে সসৈন্যে গোবরডাঙ্গার নিকট প্রতাপপুর নামক স্থানে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করেন। এক্ষণে সিদ্ধান্তবাগীশ সবিশেষ ভীত হইয়া প্রতাপের শরণাপন্ন হন। দয়ালু প্রতাপ ব্রাহ্মণের কাতরোক্তিতে তাঁহার জমিদারী গ্রহণ করিলেন না তবে যে স্থানে তাঁহার শিবির সন্নিবেশিত হইয়াছিল সেই স্থানটুকু গ্রহণ করিয়া আপনার নামে উহার প্রতাপপুর নাম রাখিলেন। এই স্থানটুকু গ্রহণের কারণ এই শুনা যায় যে প্রতাপ নিজ অধিকার ব্যতিত অন্যত্র আহার করিতেন না। এই গ্রামখানি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এখান হইতে প্রত্যাগমন কালে তিনি হালিসহর, কুমারহট্ট, জগদ্দল প্রভৃতি স্থান অধিকার করেন। প্রতাপকে দমন করিবার জন্য দিল্লীশ্বর আকবর সাহ পুনঃ পুনঃ তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন, কিন্তু বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপ পুনঃ পুনঃ তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। এই সময় সম্রাট আকবর মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গীর দিল্লীর সম্রাট হন। জাহাঙ্গীরও প্রতাপের বিরুদ্ধে তাঁহার সুযোগ্য সেনাপতি অম্বররাজ মানসিংহকে বাঙ্গালায় প্রেরণ করেন। মানসিংহ বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে বাঙ্গালায় আগমন করতঃ নদীয়া রাজ-বংশের পূর্ব্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের সহায়তায় এবং প্রতাপের কতিপয় কৃতঘ্ন আত্মীয় ও কর্ম্মচারীর বিশ্বাসঘাতকতায় বহু কষ্টে প্রতাপকে পরাস্ত করিয়া বন্দী করিয়া লইয়া যান। দিল্লীর পথে পবিত্র কাশীধামে বীর প্রতাপের জীবলীলার অবসান হয়।

এই সময়ে অন্যান্য যে সমস্ত বঙ্গীয় ভূস্বামী অত্যাচারী মুসলমান শাসন-কর্ত্তার বিপক্ষে মস্তকোত্তলন করিয়াছিলেন, নদীয়ার অন্যতম বিখ্যাত ভূস্বামী দেবগ্রামস্থ কুম্ভকার বংশীয় রাজা দেবপাল তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য। কালের কঠোর নিষ্পেষণে এই কুবের সদৃশ ধনশালী, শক্তিমান ভূস্বামীর বিস্তীর্ণ প্রাসাদ, বিপুলা পুরী ও সুগভীর পরিখাদি ধ্বংস হইয়া সাধারণতঃ "দেগাঁর ঢীবি" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহা এক্ষণে বেঙ্গল সেণ্ট্রাল রেলওয়ের মাঝেরগ্রাম নামক ষ্টেশন হইতে তিন মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। দেবগ্রামস্থিত এই পর্ব্বতাকৃতি ধ্বংসাবশেষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সহৃদয় দর্শকমাত্রেরই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠে। এখনও ইতস্ততঃ

বিক্ষিপ্ত এনামেলের ইট কারুকার্য্যময় প্রস্তরাদি ও প্রাসাদের পরিখা প্রান্তে অবস্থিত চারিটী উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপ (যাহার গঠন প্রণালী দেখিলে পূর্ব্বে শত্রু সৈন্যের গতিবিধি পর্য্যালোচনার নিমিত্ত স্থাপিত বলিয়া অনুমিত হয়) এবং অসংখ্য পুষ্করিণী, বিশেষতঃ, শোকাবহ স্মৃতি বিজড়িত রাজান্তঃপুর সংলগ্ন সুবিস্তীর্ণ সরোবর স্বতই প্রাণের অন্তস্তলে একটা বিষাদের চিত্র অঙ্কিত করে *।

রাজা দেবপাল সম্বন্ধে নানাবিধ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে; তাহাদের মধ্যে কতটুকু ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে তাহা অবধারণ করা সুকঠিন। বহু অনুসন্ধানেও আমরা এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই। সুকবি ভারতচন্দ্র তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ অন্নদামঙ্গল গ্রন্থে মান-সিংহের আখ্যায়িকার মধ্যে স্বর্গগমনোদ্যত ভবানন্দ মজুমদারের সহিত দেবী অন্নদার কথোপকথনচ্ছলে নবদ্বীপ রাজবংশের যে ভবিষ্যচিত্র অঙ্কিত

---

* "This is said to be the fort of a Mohjan Raja, who on going out to fight a battle, carried with him a pigeon giving his Ranis orders, that they should watch for the return of the pigeon. If he won the battle, he would return himself, if he lost he would loose the pigeon, whose return would intimate to the Ranis the loss of battle, and if they had any regard for the honor, they would destroy themselves. He won the battle but the pigeon got loose by accident and returned to the Raja's palace, whereupon the Ranis drowned themselves and their treasure in the "Khirki" tank behind the palace. The Raja hastned home but arrived too late to save the Ranis, whereupon in despair he drowned himself also in the tank. The tank has stone "ghats" all round and is covered on three sides with ruins of brick buildings, four high circular towers stood at the four corners of the oblong fort, which is of earth. Outside the fort are the ruins of several large temples which appear to be of great interest and of some antiquity, as evidenced by the size of the bricks. They are the only pre-Mahomedan ruins seen or heard of in the District."

"List of Ancient Monuments &c."
Published by the Government of India.

করিয়াছেন অর্থাৎ বাজপেয়ী মহারাজ রাজেন্দ্র বাহাদুর কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে রাজসভায় বসিয়া ভারতচন্দ্র নদীয়া রাজবংশের যে অতীত কাহিনী দেবীর মুখ হইতে ভবিষ্যৎ বাণীরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে দেবগ্রামের রাজবংশ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কতিপয় পংক্তি পরিদৃষ্ট হয়। ঐ ছত্র কয়েকটী হইতে ইহাই প্রতীতি হয় যে দেবপালবংশ ধ্বংস হইলে তাঁহাদের বিশাল সম্পত্তি, কি সূত্রে জানি না, ভবানন্দ মজুমদারের পৌত্র রাজা রাঘবের অধিকারভুক্ত হয়। যথা—

"গোপালের পুত্র হবে বড় ভাগ্যধর।
রাঘব হইবে নাম রাঘব সোসর॥
দেগাঁয় আছিল রাজা দেপাল কুমার।
পরশ পাইয়াছিল বিখ্যাত সংসার॥
আমার কপটে তার হয়েছে নিধন।
রাঘবেরে দিব আমি তার রাজ্যধন॥"

ইষ্টারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের চাকদহ ষ্টেশন হইতে তিন ক্রোশ পূর্ব্ব মুখে যাইলে কামালপুর নামে একখানি গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ গ্রাম প্রাচীন নদীয়ার মধ্যে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। বহু ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত এখানে বাস করিতেন; সেজন্য অনেকে এখনও ইহাকে ভট্টাচার্য্য কামালপুরও বলিয়া থাকেন। সুপ্রসিদ্ধ বনমালী বিদ্যাসাগর মহাশয় এই স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ক্ষুদ্র গ্রামখানি পশ্চাতে রাখিয়া আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে স্বচ্ছসলিল খলসিয়ার বিল দৃষ্টিপথে পতিত হয়; এই বিলের নিকট সরাবপুর নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম বিদ্যমান আছে। এই গ্রামের মধ্যস্থিত ধ্বংসাবশিষ্ট মন্দিরের অভ্যন্তরে যে মৃত্তিকা প্রথিত হস্তপরিমিত লিঙ্গমূর্ত্তি দৃষ্ট হয় উহাই সাধারণতঃ পোড়া মহেশ্বর নামে খ্যাত। ভগ্নাবশেষ মন্দিরের ভিত্তি ও উহার চতুষ্পার্শ্বস্থিত মৃত্তিকাস্তূপের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে উহা যে পূর্ব্বে ইষ্টকনির্ম্মিত বহু গৃহ প্রাঙ্গণ ও চত্বর বেষ্টিত সমৃদ্ধিশালী দেবালয় ছিল তাহা স্পষ্টই লক্ষিত হয়। সেই স্তূপ সকল এক্ষণে জঙ্গলাকীর্ণ ও শ্বাপদ সঙ্কুল হইয়া পড়িয়াছে।

কথিত আছে এ স্থানের অবস্থা হীন হইয়া পড়িলে একদা এক লোভী

সন্ন্যাসী এই পাষাণময় লিঙ্গমূর্ত্তির মস্তকদেশে একখানি স্পর্শমণি লুক্কায়িত আছে জানিতে পারিয়া এই শিবমন্দিরে আসিয়া বাস করিতে থাকে। এক দিন ঐ কপটাচারী ভাবিল যদি চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া ঐ লিঙ্গমূর্ত্তি উত্তপ্ত করা যায়, তবে ঐ মণি মস্তক হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে; কিন্তু পাছে দগ্ধ করিলে লিঙ্গমূর্ত্তি গ্রামবাসীগণকে মন্দির রক্ষার্থে আহ্বান করেন সেই আশঙ্কায় এক চাতুরী অবলম্বন করিল। সে বহু কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া ঐ মন্দিরে সঞ্চয় করিল এবং উপর্য্যুপরি কয়েক রাত্রি ভীষণ অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া স্বয়ং ঐ অগ্নিকুণ্ডমধ্যে উপবেশন পূর্ব্বক "কে কোথায় আছ গ্রামবাসি! দেখ পামর সন্ন্যাসী আমায় দগ্ধ করিতেছে" ইত্যাদি আর্ত্তনাদ করিতে থাকে। গ্রামবাসীগণ প্রথম প্রথম কয়েক রাত্রি ঐ ভয়ঙ্কর চিৎকারে আকৃষ্ট হইয়া মন্দিরে আগমন করিয়াছিল; কিন্তু প্রত্যহ সন্ন্যাসীকে এইরূপ চিৎকার করিতে শুনিয়া শেষে তাহাকে উন্মাদগ্রস্ত স্থির করিয়া আর কেহ সে বিষয়ে মনোযোগ করিত না। এক দিন ঐ সন্ন্যাসী লিঙ্গমূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে স্তূপাকারে কাষ্ঠ সজ্জিত করিয়া অগ্নি প্রদান করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে যখন অগ্নি ভীষণাকার ধারণ করিল তখন লিঙ্গমূর্ত্তি হইতে ভয়ঙ্কর শব্দ বিনির্গত হইতে লাগিল, কিন্তু গ্রামবাসীগণ উহা উন্মাদগ্রস্ত সন্ন্যাসীরই কার্য্য বিবেচনায় সে কথা কেহ শুনিয়াও শুনিল না, সন্ন্যাসীর এই পৈশাচিক কার্য্যে বাধা দিতে কেহই অগ্রসর হইল না। দেখিতে দেখিতে সেই উজ্জ্বলমণি পাষাণ মূর্ত্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে নিপতিত হইল। এতদিনে সন্ন্যাসীর মনস্কামনা পূর্ণ হইল। সেই অমূল্য নিধি ঝুলির মধ্যে লুক্কায়িত রাখিয়া রাত্রি থাকিতে থাকিতে সন্ন্যাসী তথা হইতে প্রস্থান করিয়া দেবগ্রামে উপস্থিত হইল। তখন দেবগ্রামে বহু কুম্ভকারের বাস ছিল। সন্ন্যাসী ঐ গ্রামে উপস্থিত হইয়া দেবপাল নামক একজন কুম্ভকারের গৃহে অতিথি হইল এবং ঝুলিটী ঐ কুম্ভকারের কুটীর প্রান্তে ঝুলাইয়া রাখিয়া স্নানার্থ গমন করিল। তখন বর্ষাকাল—হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় কুম্ভকারের জীর্ণ চাল হইতে জল পড়িয়া ঐ ঝুলিটী সিক্ত হইতে লাগিল এবং স্পর্শমণি সংস্পর্শে ঐ জলধারা অপূর্ব্ব গুণ প্রাপ্ত হইয়া গৃহস্থিত যে কোন ধাতবপদার্থের সংস্পর্শে আসিতে লাগিল তাহাই সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হইল। এই

অত্যদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া কুম্ভকার যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইল এবং সাগ্রহে সন্ন্যাসীর অসাক্ষাতেই তাহার ঝুলিটী অনুসন্ধান করায় সেই অমূল্য-নিধি প্রাপ্ত হইল এবং এক নিভৃত স্থানে উহা লুক্কায়িত রাখিয়া পুনরায় স্বকার্য্যে মনোনিবেশ করিল। সন্ন্যাসী স্নানান্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিল যে তাহার এত কষ্টের এত সাধনার ধন অপহৃত হইয়াছে। তখন সে আকুলপ্রাণে দেবপালের শরণাপন্ন হইয়া মণি প্রত্যর্পণের নিমিত্ত সকাতরে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিল কিন্তু তাহাতে বিফলমনোরথ হইয়া এক বৃহৎ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া এই বলিয়া পূর্ণাহুতি দিল, "যেন ঐ মহামণিই দেবপালের সর্ব্বনাশের মূল হয়—আর যেন অচিরাৎ সে নির্ব্বংশ হয়—ও সেই গ্রামে যেন কখন কোন কুম্ভকার আসিয়া বাস না করে—করিলে সেও যেন সবংশে নির্ব্বংশ হয়।" দেবপাল সেই স্পর্শমণির গুণে ক্রমে কুবের সদৃশ ধনশালী হইয়া উঠিলেন এবং নিজ বাসগ্রাম অধিকার করিয়া ইন্দ্রপুরী সদৃশ প্রাসাদ ও মন্দিরাদি নির্ম্মাণ এবং সুবৃহৎ সরোবরাদি খনন করাইয়া স্বীয় নামে ঐ গ্রামের "দেবগ্রাম" নাম করণ করিলেন। ক্রমে ঐ ক্ষুদ্র গ্রাম নগরের আকার ধারণ করিল এবং দেবপাল একজন ক্ষমতাশালী ভূম্যধিকারী হইয়া উঠিলেন।

শ্রীকুমুদনাথ মল্লিক।

দ্বারকার পথে।

(৩)

গাড়ী আবার ছুটিল। ভড়োচ হইতে খানিকটা পিছাইয়া আসিয়া অন্য পথ অবলম্বন করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। মধ্যে মধ্যে দুই একটী বড় ষ্টেসনে নামিয়া এদিক ওদিক দেখিতেছি। চিরদিন যে ভাটিয়া সুন্দরীর রূপ-লাবণ্যের কথা শুনিয়া আসিতেছি আজি সেই ভাটিয়া রমণীর দুই একটী নয়নপথের পথিক হইতেছে। ধূনার ধূমে পাকান মর্ত্তমান রম্ভার রং দেখিয়াছেন—সেইরূপ গৌরবর্ণা; দুধে আলতার অভাব—গড়ন পিটন ত

দেখিবার উপায় নাই। চাহিয়া চাহিয়া দেখাওত ভদ্র রীতির বিরুদ্ধ। দ্বিতীয় শ্রেণীতে অনেকগুলি অপরিচিত বাঙ্গালী ভদ্রলোক দেখিয়া তাঁহাদিগকে দেখিতে গিয়া সহসা নিমেষকাল যে দৃষ্টি পড়িয়াছিল তাহারই ফল ঐ টুকু। পাঠক পাঠিকা আমাকে মাফ করিবেন তবে সাহিত্য সেবক সাহিত্য সংসারে নূতন দ্রব্য আনিতে পারগ। আমার সাফাই না হয় ঐ পর্য্যন্ত। বোধ হয় ইহাদের মধ্যে স্ত্রী-স্বাধীনতা নাই। অলঙ্কারের মধ্যে মুক্তার ছড়াছড়ি—নানা আকারের নানাবিধ মুক্তা। সে যাহাহৌক বাঙ্গালী বাবুদের মধ্যে এক জন পরিচিত বাঙ্গালী দেখিতে পাইলাম। তিনি আমার সঙ্গে দ্বারকা যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন, সব ঠিকঠাক হইয়া গেল, এমন সময় হঠাৎ বরদা ষ্টেসনে গাড়ী থামিলে—তিনি বলিলেন বন্ধুবর্গের অনুরোধে তিনি দ্বারকা যাইতে অপারগ। মিত্র লাভের সব আশা ফুরাইল।

বরদা ষ্টেসনে গাড়ী পৌছিবার পূর্ব্ব হইতেই আমরা দূর হইতে একটী কলস—পিতল কি সুবর্ণের জানি না—দেখিতে পাইতেছিলাম, সূর্য্যকিরণে কলসটী ঝক্ ঝক্ ঝলসিতেছিল। লোকমুখে শুনিলাম বরদারাজ গুইকুমারের রাজবাটীর গুম্বজের কলস। তখন বুঝিলাম কলসটী পিতলের নহে সুবর্ণের হইবে। যে সকল বাঙ্গালী বরদা রাজ্য দর্শন বা ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা দলে দলে নামিয়া গেলেন। গাড়ীতে বাঙ্গালীর মধ্যে আমরা দুই মূর্ত্তি রহিয়া গেলাম। মনকে প্রবোধ দিলাম যে অগ্রে দ্বারকা দর্শন পরে অন্য কথা—আমি এখন তীর্থযাত্রা করিতেছি, আমি এখন ভবঘুরের মত—যাহা ইচ্ছা তাই করিতে পারিব না।

ক্রমে গাড়ী আসিয়া আমেদাবাদ সহরে পঁহুছিল, আমাদিগকে এই স্থানে গাড়ী বদল করিতে হইবে। সুতরাং নামিয়া বিশ্রাম করিতে গেলাম। আমেদাবাদ সহর প্রকাণ্ড সহর। আর এই সহরের চতুর্দ্দিকে প্রাচীর। সহরে প্রবেশ করিতে হইলে গেট দিয়া যাইতে হয়। শুনিলাম ১৬ গেট আছে। নব্বইটী কাপড়ের কল আছে—সব দেশী লোকের হাতে। গুজরাটে প্রবেশ করিয়া অবধি রেলের দুই ধারে যে ক্রমাগত তুলার চাষ দেখিয়া আসিতেছিলাম আর প্রায় প্রতি রেল ষ্টেসনের নিকট একটী করিয়া তুলার কল (Cotton mill) দেখিয়া আসিতেছিলাম—এতক্ষণে, এই ৯০টী কলের

কথা শুনিয়া তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম। বুঝিলাম এ অঞ্চলের লোকে বঙ্গবাসীর মত বাক্যবীর নহে, ইহারা কর্ম্মবীর। একজন ব্যারিষ্টারের মুন্সী তাহার সাহেব অর্থাৎ ব্যারিষ্টারকে লইতে আসিয়াছিলেন। তিনি ট্রেণে বোম্বাই হইতে আসিবেন। মুন্সীজীর মুখে সহরের অনেক সংবাদই শুনিলাম। তিনি সহর দেখিবার জন্য নিতান্ত জিদ করিতে লাগিলেন। আমি কিছুতেই রাজি হইলাম না। দ্বারকানাথকে স্মরণ করিয়া সহরের মায়া কাটাইলাম। যাহাহৌক বলিয়া রাখি এই একটী সহরে ৯ জন ব্যারিষ্টার আছেন। সহরটী একটী প্রকাণ্ড সহর আকারেও বটে ভারীত্বেও বটে, বহু লোক বাস করে—বিদেশীর সংখ্যাই বেশী। সহর সব বিলাতী ভাবাপন্ন। দালাল, ঠিকাদার, কমিশন এজেণ্ট বা আড়তদার, এজেণ্ট, সব্ এজেণ্ট, সওদাগর ইত্যাদি ইত্যাদিতে সহর একেবারে পরিপূর্ণ। যেখানে কান পাত ব্যবসা বাণিজ্য ছাড়া কথা বার্ত্তা নাই। আমাদের দেশে বসিয়া "কৃষ্ণা" মিলের নাম শুনিয়াছি। এক সময় কৃষ্ণা মিল না থাকিলে বাঙ্গালীর স্বদেশী বয়কট ব্রত নিশ্চয়ই ভঙ্গ হইত। কৃষ্ণা মিল, ভগবতী মিল, বোম্বাই প্রভৃতি সহরের অন্যান্য মিল আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া যথেষ্ট ধন্যবাদ পাইয়াছেন ও লৌহসিন্দুক সুবর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রায় পরিপূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এত লাভের পর এত দেখিয়া শুনিয়া আমরা কেবল একটী মাত্র মিল "বঙ্গলক্ষ্মী" স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছি উপেন্দ্রনাথ সেন দেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়গণের স্থান প্রত্যেক বাঙ্গালী নর নারীর হৃদয় শতদলে। সে যাহা হৌক একটী মিল বাঙ্গালী খুলিয়াছেন বটে, কিন্তু বাঙ্গালী Cotton mill তুলার কল অর্থাৎ তুলার বীচি বাহির ঝাড়া পেঁজা পরিষ্কার করণ গাঁইট বাঁধা এই সব কার্য্যের জন্য এদেশে এখনও রীতিমত তুলার চাষও আরম্ভ হয় নাই ও তুলার কল একটীও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। বি, এন, আর রেলের মেলে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া গাড়ীতে এক রাত্রি যাপন করিয়া প্রাতঃকালে দুই ধারে মুখ বাড়াইলেই এই তুলার কল দেখিতে পাওয়া যায়। তবে বিলাসপুর কাম্‌তী, নাগপুর এ সব স্থানেত ঐরূপ কল ছাইয়া ফেলিয়াছে। তুলার চাষ না হইলে ঐরূপ কলের প্রয়োজনীয়তা বুঝা যাইবে

না তাহা আমরা বুঝি। বাল্যকালে দেখিয়াছি প্রত্যেক লোকের বাটীতে কাপাসের গাছ। উঠানে—পাঁদাড়ে আশে পাশে যেখানে সেখানে সকলেরই কাপাস গাছ ছিল। গাছ না থাকিলে কাপড় হইবে কোথা হইতে? সকলেইত আর দিগম্বর সাজিতে পারে না, সকলেইত আর দিগম্বর হইবার অধিকারী নহে। পিতামহী কাটিতেন সূতা—সুটী বাড়ীতে হইত আমাদের অর্থাৎ ছেলেদের কাপড় "মুচেন" আর কর্ত্তাদের জন্য হইত "তেঁতেন" মিহি সূতার কাপড়। বিধবারা মুচেন পরিতেন সধবারা অপর দিকে আবার তেঁতেন পরিতেন। ভাল চাওত কাপাসের চাষ কর, একা না পার দল বাঁধ, কোম্পানী কর সেয়ার খোল। কেন কয়লার ব্যবসাত বেশ চালাইতেছ—আবেগে অনেক বার্ কথা লিখিয়া ফেলিলাম, এটী আমার রোগ, দোষ, কিন্তু কেহ কেহ বলেন ওটী "বিদ্যার" গুণ—গুণ হয়ে দোষ হল—বিদ্যার বিদ্যায়।

আজ কাল ভয়ে দেশের বন্ধু বলিয়া অনেকে পরিচয় দেওয়া বন্দ করিয়াছেন। আমি কিন্তু আবশ্যকীয় কথা সব বলিব—শত্রু হই বন্ধু হই আপনারা দেখিয়া লইবেন। কি মুটের অত্যাচার!!! সেত মোর দেশের লোক—এখানে তার নাম "মজুর"—সারা গুজরাটে সে "মজুর", কিন্তু বড়ই অত্যাচার। যাহা সেখানে আধ আনায় হয়, এখানে তাহা চারি আনা, সিকি ছাড়া কথা নাই মোট নামাইল—সিকি দাও আবার তুলিবে—সিকি দাও, নূতন গাড়ীতে উঠিয়া এমনই একটা মজুরের সঙ্গে আমার ঝগড়া বাধিল; তুমুল। আমার পক্ষ অবলম্বন করিয়া কথা কহিলেন যে ব্যক্তি তিনি সুরত সহরে কংগ্রেস দেখিতে গিয়াছিলেন—ফিরিতেছেন। ইংরেজী জানেন। তিনি যাইবেন বড়বান্ সহরে (Wadhun লোকে উচ্চারণ করেন যেন ঠিক বর্দ্ধমান) তিনি যখন আমার পক্ষ অবলম্বন করিয়া মোটের কথা তুলিলেন তখন মুটিয়া ইংরেজী ঝাড়িতে লাগিল। বুঝিলাম আধ আধ লেখা পড়া জানা লোক অথচ ফালসো অহংকার নাই, ষ্টেসনে মজুরের কাজে পরিশ্রম নাই অথচ বেশ দু পয়সা উপায় আছে দেখিয়া ঐ পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। যখন আইনের কথা উঠিল তখন—ইনি ছাড়িবার পাত্র নন বুঝিয়া—মজুর মহাশয় তর্জ্জন গর্জ্জন ত্যাগ করিয়া

মিনতিসূচক স্বরে বলিলেন, "বাবু বড় লোক কিছু নিচ্চি—আপনি আইনের কথা ছাড়ুন না"। এই বলিয়া উদরে হাত বুলাইল। তখন সেই ব্যক্তি আমাকে বলিলেন ইহার পর আর তর্ক চলে না।

সেই ব্যক্তির সহিত আলাপ হইলে পরম পরিতুষ্ট হইলাম—কংগ্রেস ও স্বদেশীর কথা উঠিল দেখিলাম তরঙ্গ বেশ লাগিয়াছে। আমার পাশের গাড়ীতে একটী স্ত্রীলোক ছিল। তাহাকে কি বলিয়া বর্ণনা করিব? আমেজান (Amazon), তাড়কা, কুম্ভীনশী, না নবীন তপস্বিনীর জগদম্বা। খাড়া ৬ ফিট আর তার উপর মোটা। ভদ্রলোকটী স্ত্রীলোকটীকে দেখাইয়া বলিলেন—"দেখুন ইহারা স্বামী স্ত্রী। (দেখিলাম যেমন দেব তেমনি দেবী—বেশ সাজন্ত বটে।) ইহারা মেষ-পালক। অনেক সময়ে এই সকল স্ত্রীলোককে একা বাঘের সঙ্গে লড়িতে হয়। প্রায়ই বাঘ পরাজিত হয়। ইহাদের হাতে যদি একটা লাঠি বা কুঠার রহিল ত বাঘের আর নিস্তার নাই। ইহাদের বল বীর্য্য সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কথা সকলেই জানে। ইংরেজও জানে। আপনারা জানেন না।"

ইহারই মুখে গীর্ণার পাহাড়ের বিবরণ, প্রভাসের বিবরণ, পোর বন্দরের ও দ্বারকার বিবরণ জ্ঞাত হইলাম। মুখে মুখে টাইমটেবেল বলিয়া দিলেন। এ দেশের লোক বেশ সহৃদয়, আমাকে বিশ্রাম করিবার জন্য অর্থাৎ শয়ন করিবার জন্য গাড়ীর সকলেই অনুরোধ করিলেন ও স্থান পরিষ্কার করিয়া দিলেন। বলিলেন যথাসময়ে আমাকে তুলিয়া দিবেন। সহৃদয়তার কথা যখন উঠিয়াছে—তখন একটা বড় কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আমেদাবাদ সহরে আছেন শ্রীযুক্ত অম্বালাল শেখরলাল। ইনি বরদা রাজ্যে চীফ জষ্টিস ছিলেন। ইঁহার উপাধি "দেওয়ান বাহাদুর।" ইনি ৩০ জন বাঙ্গালীকে নিজ খরচায় আমেদাবাদ সহরে রাখিয়া কল কারখানা সম্বন্ধে শিক্ষা দান করিতেছেন। এই সকল বাঙ্গালী ছাত্র কল সম্বন্ধে জুতা সেলাই চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত সমস্ত অবশ্যজ্ঞাতব্য সকল কথাই শিক্ষা করিবেন ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে দেশে ফিরিতে পারিবেন বা ইচ্ছা করিলে তথা কার্য্য করিতে পারিবেন। উপযুক্ত বেতন পাইবেন, বলাই বাহুল্য, দেওয়ান বাহাদুর এক বৎসর ৩০টী ছাত্র লইয়া ক্ষান্ত হন নাই,

ছচর বছর কয়েক বৎসর লইয়াছিলেন। এখন ছাত্র লওয়া বন্ধ আছে, ইঁহাদের একটা হেস্তনেস্ত হইলে তবে নূতন ছাত্র লইবার বন্দোবস্ত হইবে। দেওয়ান বাহাদুর অম্বালালের হৃদয়টা বড় উদার। ইনি কংগ্রেসের একজন বড় পাণ্ডা, ঐরূপ লোক থাকায় কংগ্রেস মহিমান্বিত তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

আবার গাড়ী চলিয়াছে। এ রেল ছোট রেল, মিটার গেজ। যাহারা প্রশস্ত পথের রেলে চাপিয়াছে, তাহাদের পক্ষে এ ছোট রেল বড়ই কষ্টকর কিন্তু উপায়াভাবে বড় ছোট সকলকেই এই পন্থা অবলম্বন করিতে হইতেছে। যাঁহারা মালগাড়ীর ব্রেকভানে কখনও ভ্রমণ করিয়াছেন তাঁহারা কষ্টের অনেকটা উপলব্ধি করিতে পারিবেন—হেঁচকা টানে প্রাণ বাহির। যাঁহারা বঙ্গদেশ হইতে একেবারে দ্বারকা আসিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা রাজ-পুতানা মালব রেলওয়ে হইয়া একেবারে আমেদাবাদে আসিবেন। যাহা হৌক মধ্য রাত্রিতে আমরা বড়বন্ ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে আবার গাড়ী বদল। পরিচিত বন্ধুটী বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। আমরাও মোট মোটারী লইয়া আবার গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। সেই মিটারগেজ রেল সুতরাং ভাজনা খোলা হইতে অগ্নিতে গমন—কিন্তু এ গাড়ীতে উঠিয়া বড় আনন্দ হইল। গাড়ীশুদ্ধ লোক সাধু, একটী কাবুলী দম্পতী ছাড়া আর আমরা ছাড়া। আরও একজন ছাড়া জুনাগড়ের নবাবের পুলিসের একজন কর্ম্মচারী। সাধুগণকে জিজ্ঞাসায় জানিলাম আপাতত তাঁহারা সকলেই দ্বারকা চলিয়াছেন, তার পর সেখান হইতে কেহ কচ্ছ মাণ্ডবী যাইবেন, কেহ হিংলাজ (হিঙ্গুলা) যাইবার জন্য করাচী যাইবেন। করাচী হইতে ১২৫ ক্রোশ উট-সওয়ারে যাইতে হয়। কেহ বলিলেন যাইবেন নারায়ণ সরোবর। নারায়ণ সরোবর এখানে—এই প্রদেশে, শুনিয়া প্রাণে বড় সুখ হইল, তখন মানস চক্ষে চারিটী সরোবর একবার দেখিয়া লইলাম। প্রথমটী হইতেছে মানস সরোবর—হিমালয়ের উত্তরাংশে তিব্বত প্রদেশে। দ্বিতীয়টী বিন্দু সরোবর—উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বরের নিকট। তার পর পম্পা সরোবর। নাসিক হইতে যাইতে হয়। ইহারই নিকট গঙ্গাপুরে গোদাবরীর উৎপত্তি স্থানে ৭টী জলপ্রপাত আছে। ভব-

ভূতির উত্তররামচরিতে—রামচন্দ্রের মুখে এই পম্পা সরোবরের যথেষ্ট সুখ্যাতি আছে। রামচন্দ্র তখন সীতাকে অন্বেষণ করিতেছেন। চক্ষু হইতে একটী অশ্রুধারা বহিয়া গিয়াছে আর একটী নূতন অশ্রুধারা প্রবাহিত হইবার পূর্ব্বে মূহূর্ত্তমাত্র কালে রামচন্দ্র এই পম্পার শোভা দর্শন করিয়া মোহিত হইয়াছিলেন। তার পর চতুর্থটী হইতেছে নারায়ণ সরোবর—এই ভূজ প্রদেশে। ভূজনগর হইতে ৩ দিন ক্রমাগত গো-শকটে যাইতে হয়।

আমাদের গাড়ীতে আরও একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিলাম, একজন অন্ধ ৺দ্বারকা যাইতেছেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম তিনি হাইদরাবাদ হইতে আসিতেছেন—পাঠক মহাশয় ব্যাপার বুঝুন! আমাদের নিজের উপর একটা ঘৃণা হইল।

শেষ রাত্রিতে একটু বেশ শীত বোধ হইল। সুরত সহরে আদৌ শীত ছিল না। ভোরের সময় আমরা ঢোলা জংসনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে আবার গাড়ী বদল। নূতন গাড়ী লাগিয়াই ছিল। মোট-ঘাট সেই গাড়ীতে রাখিয়া আমরা প্রাতঃকৃত্য সারিলাম। হিন্দু ব্রাহ্মণ তপ্ত চা বিক্রয় করিতেছে। তদ্রূপ মুসলমানে বিক্রয় করিতেছে। আর সাহেবদের জন্য হোটেল ও চায় ব্যবস্থা ত আছেই। এখানে একটী নূতন দৃশ্য দেখিলাম। অর্থাৎ তিনটী হোটেল—একটী সাহেবদের, একটী মুসলমানদের আর একটী হিন্দুদের। ব্রাহ্মণের রান্না ভাত ডাল তরকারি স্নান করিয়া তপ্ত তপ্ত খাইয়া লইতে পারেন। ভাল ব্রাহ্মণ সারস্বত ব্রাহ্মণ। আর একটী নূতনত্ব এখন হইতে আরম্ভ হইল পবন-চরকীতে কূপ হইতে জল তোলা। সুতরাং ষ্টেসনে জলের কল আছে।

শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়।

২৬শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার সকাল ৬টার সময় আমাদের গাড়ী শিলিগুড়ি ষ্টেসনে আসিল। এখানে নামিয়া Darjeeling Himalayan Railwayর গাড়ীতে চড়িলাম। গাড়ীগুলি খুব ছোট। কতকটা হাবড়া আমতা রেলের মত। প্রতি গাড়ীতে ৫।৬ জন বসিতে পারে; কিন্তু লেখা আছে "আট জন বসিবে।" গাড়ী বেশ জোরে চলিতে লাগিল। ষ্টেসনের নিকটে অনেক কদম গাছ আছে। তাহাতে অনেক ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। রেলের ধারে শাল প্রভৃতি নানা গাছ দেখিতে পাওয়া গেল। গাছগুলি প্রায় ৪।৫ তোলা হইবে। গাড়ী অধিক অগ্রসর হইলে দুই ধারে ঘন নিবিড় বন দেখা গেল। American forest প্রভৃতির ছবি দেখিলে এই বনের কতকটা ধারণা করা যাইতে পারে। এইবার গাড়ী পাহাড়ের উপর দিয়া চলিতে লাগিল। চারি ধারে পাহাড়, একটুও সমতল ভূমি নাই। ষ্টেসনগুলি পাহাড়ের গায়ে। দূর হইতে অনেক উপরে ষ্টেসন দেখা যায়। গাড়ী ঘুরিতে ঘুরিতে উপরে উঠিতে লাগিল। প্রায়ই আঁকিয়া বাঁকিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল। পাহাড়ের উপর দিয়া, অরণ্যের ভিতর দিয়া গাড়ী বৃহৎ অজগর সর্পের ন্যায় উঠিতেছে। পাহাড়ের মধ্যে মধ্যে ঝরণা। স্থানে স্থানে গাড়ী ঝরণা হইতে জল লইতে লাগিল। রেলের দুই পার্শ্বের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। এ দৃশ্য না দেখিলে ভাল করিয়া বুঝা যায় না। কতকগুলি বৃক্ষে সুন্দর প্রস্ফুটিত পুষ্প দেখা গেল। এ দেশের সকল বাড়ীই পাহাড়ের গায়ে। কোন দুইটী বাড়ী এক সমতলে নাই। এক এক সময় গাড়ী কোথা দিয়া কোথায় আসিল দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল। এক স্থানে রেল প্রায় গোল হইয়া গিয়াছে। গার্ডগাড়ী যখন নীচে, তখন এঞ্জিন ঠিক তাহার উপরের একটী পুলের উপর।

গাড়ী ক্রমে কারসিয়ং আসিল। আমরা এখানে নামিলাম। ষ্টেসনে সাহেবদের হোটেল আছে। এদেশে স্ত্রীলোকেরা মোট বহে। তাহাদের নিকট খানিকটা 'নেয়ার' ও তাহার দুই মুখে বাঁধা একটী দড়ী থাকে।

তাহারা কপালে সেই 'নেয়ার' দিয়া পিঠের উপর জিনিসপত্র ফেলিয়া, সেই দড়িতে আটকাইয়া অনায়াসে লইয়া যায়। ইহারা খুব ভারি দ্রব্যও এইরূপে লইয়া যায়। হিন্দি অল্প বুঝে, পুরুষেরা ইহাদের অপেক্ষা ভাল বুঝে ও বেশ বলিতে পারে। ইহাদের অনেকেরই রং ফর্শা। সকলেরই নাক বসান। ঘাগরা পরে, জামা গায়ে দেয়, হাত বাহিরে বাখিয়া জামার উপর একটা কাপড় বাঁধে, মাথায় একটী পুরু কাপড় দিয়া তাহা পিঠের দিকে ঝুলাইয়া দেয়। ইহাদের সকলেরই খালি পা। পুরুষেরা কোট পেণ্ট্‌লুন পরে, মাথায় টুপি দেয়। ইহাদেরও অনেকের পা খালি থাকে। ইহারাও স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় মোট বহে। এখানকার বাড়ীগুলি কাঠ, পাথর, টিন ও কাচ দিয়া নির্ম্মিত। অনেকগুলি বাড়ীর দেওয়াল কতকটা পাথরের, বাকি অংশ কাঠের। জানালা কাচের ও কাঠের। সকল বাড়ীর ছাতে টিন মারা। এখানে বাড়ী তৈয়ার করিতে অনেক খরচ পড়ে। কতকগুলি নানাপ্রকার বিলাতি দ্রব্যের দোকান আছে। তরকারী প্রভৃতি অনেক প্রয়োজনীয় দ্রব্য শিলিগুড়ি হইতে আনাইতে হয়। একখানি হিন্দুস্থানী ময়রার দোকান আছে। খাদ্যদ্রব্য আনাইতে অনেক খরচ পড়ে। সোমবার আহারাদির পর বেড়াইতে বাহির হইলাম। ষ্টেসন হইতে Dow-hill নামক একটী পাহাড় উঠিয়াছে। এই পাহাড়ের গায়ে একটী বেশ চওড়া রাস্তা আছে। সেই রাস্তা ধরিয়া উঠিতে লাগিলাম। এ রাস্তা রেলের মত ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিয়াছে। এ দেশের অধিকাংশ রাস্তাই এইরূপ। রাস্তার ধারে মাঝে মাঝে বাড়ী আছে। এ রাস্তা 'গুম' হইয়া দার্জ্জিলিঙ্গে গিয়াছে। 'গুম' ষ্টেসনের পর দার্জ্জিলিং ষ্টেসন। প্রায় ২ মাইল এই রাস্তা ধরিয়া গিয়াছিলাম। সেখানে গবর্ণমেণ্টের 'ট্রেণিং কলেজ' ও একটী বালিকা বিদ্যালয় আছে। এই বিদ্যালয়টী দেখিতে বেশ সুন্দর। কারসিয়ংএ সাহেব ভিন্ন অন্য কোন জাতির জন্য বিদ্যালয় নাই। এ সকল পাহাড়ে বাঘ নাই তবে সাপ থাকা সম্ভব। এখানে এক প্রকার ধুতুরা ফুল দেখিতে পাইলাম। সেগুলির গন্ধ মিষ্ট। ফুলগুলি লম্বে প্রায় ১ ফুট। পাহাড়ের গায়ে স্থানে স্থানে চা বাগান দেখিতে পাওয়া যায়। রেল হইতে অনেক চা গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। চা গাছের

ছোট ছোট ঝোপ সারিবন্দি করিয়া বসান। ঝোপগুলির উপরিভাগ গোল করিয়া ছাঁটা।

বৈকালে পুনরায় বেড়াইতে বাহির হইলাম। কারসিয়ং হইতে রেল যে রাস্তা দিয়া গিয়াছে এবার সেই রাস্তা দিয়া যাইতে লাগিলাম। এই রাস্তায় ষ্টেসন হইতে অল্পদূরে একটী বড় হোটেল আছে। ইহার নাম Clarendon Hotel. গাড়ী এই হোটেলের নিকট থামে। এই হোটেল ছাড়াইয়া একটু দূরে যাইয়া একটী ছোট ঝরণা দেখিতে পাইলাম। এই ঝরণাটীর জল পাহাড়ের গা হইতে বাহির হইতেছে; উপর হইতে পড়িতেছে না। শীতকালে, বর্ষাকালে একইভাবে জল পড়িতে থাকে। এই ঝরণার জল এখানকার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী। এখানকার অধিবাসী বাঙ্গালীরা ঔষধের মত এ জল ব্যবহার করেন। এই ঝরণা দেখিয়া ফিরিয়া আসিলাম। কারসিয়ংএ বাঙ্গালার কয়েকজন মহারাজা ও বড় জমীদারের বাটী আছে; কাকিনার কুমার মহিমারঞ্জনের রাজভবন সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। মঙ্গলবার প্রাতে ষ্টেসন হইতে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখিতে পাইলাম। বেশ পরিষ্কার দেখা গেল। তুষার ধবলিত শিখরে সূর্য্য কিরণ পতিত হইয়া অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতেছিল। পর্ব্বতের স্থানে স্থানে রৌদ্র পড়ে নাই, সেই স্থানগুলি নীলবর্ণ দেখাইতেছিল। কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখর দেশ কাঞ্চন বরণ ধারণ করিয়াছিল। আহারাদির পর আবার দার্জিলিং মেলে উঠিলাম।

গাড়ী ক্রমে উপরে উঠিতে লাগিল। পরে ঘুমে আসিয়া পৌঁছিল। ঘুম সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। ইহা সমুদ্র হইতে ৭৪০৭ ফিট উপরে। দার্জিলিং কয়েক শত ফিট নামিয়া যাইতে হয়। দার্জিলিং ষ্টেসনের নিকটে Lowis Jubilee Sanitarium (লুইস জুবিলি স্যানিটেরিয়াম্)। আমরা এই স্যানি-টেরিয়ামে থাকিলাম। বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইলাম। রেল রাস্তা হইতে উপরে উঠিলে Mall (মল) নামক বেড়াইবার স্থান। মলে উঠিবার রাস্তায় অনেকগুলি দোকান আছে। সাহেবদের Whiteaway Laidlaw প্রভৃতি কয়েকটী বড় দোকান আছে। দোকানগুলির পর Mall। এখানে উঠিবার আরও রাস্তা আছে। Observatory Hill নামক পাহাড়ের চারি ধার দিয়া Mall নামক বেড়াইবার রাস্তা গিয়াছে। এই রাস্তার ধারে

লাট সাহেবের বাটী। ইহার নাম Shrubbery. ভিক্টোরিয়া পার্কও এই রাস্তার ধারে। এই পার্কে অনেক সাহেব বৈকালে বেড়াইতে আসেন। কালা গোরা সকলেই এই পার্কে বেড়াইতে পারেন। শনি ও মঙ্গলবারে এই পার্কের ভিতর 'ব্যাণ্ড' বাজে। লাট সাহেবের বাড়ীর দক্ষিণ পার্শ্বে একটী বড় 'ওক' গাছ আছে। আজ মল বেড়াইয়া ফিরিয়া আসি। পথে বৃষ্টি হয়। এখানে প্রায়ই এই সময়ে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়। সূর্য্য ভাল করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না।

বুধবার প্রাতঃকালে আমরা এখানকার Botanical Garden ও Museum দেখিতে গেলাম। উচু নিচু জমির উপর এই বাগান। বাগানটী দেখিতে অতি সুন্দর। এই বাগানের মধ্যে Museum এ দুটী ঘর আছে। তাহাতে নানা প্রকার প্রজাপতি, সাপ, পাখী ইত্যাদি আছে। বাগানের ভিতর একটী কাচের ঘরে নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটিয়া আছে। আমরা আহারাদির পর লিবং দেখিতে যাই। লিবং এখানকার ইংরাজ-সৈনিকদের একটী প্রধান আড্ডা। বাজারের উত্তর দিয়া লিবং রোড (Lebong Road) গিয়াছে। এই রাস্তা ধরিয়া বরাবর যাইতে লাগিলাম। রাস্তার বামপার্শ্বে কাছারি দেখিতে পাইলাম। আমরা কাছারির ভিতর যাই নাই। আরও অধিকদূর অগ্রসর হইয়া আমাদের দক্ষিণ পার্শ্বে বালিকা-বিদ্যালয় ও গোরস্থান দেখিতে পাইলাম। ইহার পার্শ্বেই বার্চহিল নামে একটী পাহাড়। আরও অধিকদূর অগ্রসর হইয়া আমাদের বাম পার্শ্বে St. Joseph's College দেখিতে পাইলাম। কলেজবাড়ী পাথরের। দার্জ্জি-লিঙ্গের মধ্যে এই বাড়ীটী বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এ কলেজটী সাহেব-দের জন্য। ষ্টেসন হইতে এই কলেজটী প্রায় ৩ মাইল। ক্রমে লিবংএ আসিয়া পৌঁছিলাম। রাস্তা হইতে বারিকগুলি অনেক নিম্নে। এখানে প্যারেড্ করিবার জন্য অনেকটা জমি সমতল করা হইয়াছে। এইরূপ বিস্তৃত সমতল ভূমি দার্জ্জিলিঙ্গে আর নাই। বারিকগুলি ছোট ছোট পাহাড়ের গায়ে। এখানে ভুটিয়াদের নিকট ঘোড়া ভাড়া পাওয়া যায়। বারিক-গুলির নিকট আমাদিগকে যাইতে দিল না। সেই স্থান হইতে অল্পদূরে একটী খুব উচ্চ পাহাড়। তাহার মাথায় কতকগুলি বাড়ী দেখিতে পাওয়া

যায়। এইটী ভুটিয়া বস্তি। সেখানে শুনিলাম ভুটিয়াবস্তির ভিতর দিয়া যাইলে অল্প পথ যাইতে হয়; সময়ও অল্প লাগে। আমরা লিবং রোডে উঠিয়া আসিলাম। এই রাস্তা পর্য্যন্ত উঠিতে কষ্ট হয়। এখানে এইরূপ কষ্ট অতি অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিবার পরই দূর হয়। আবার উঠিতে লাগিলাম। এবার অনেক উচুতে উঠিতে হইল। ক্রমে ভুটিয়াবস্তির ভিতর আসিয়া পড়িলাম। আমরা আরও উঠিতে লাগিলাম। ক্রমে Mallএ আসিয়া পৌঁছিলাম। অল্প সময়ের মধ্যে আমরা ফিরিতে পারিয়াছিলাম। ভুটিয়াবস্তির ভিতর দিয়া লিবং যাইয়া লিবং রোড দিয়া ফিরিয়া আসিলে কষ্ট হয় না।

বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে ষ্টেসনের নিকট আসিয়া কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখিতে পাইলাম। কারসিয়ং হইতে আরও ভাল করিয়া দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। আমরা Observatory hillএ বেড়াইতে যাইলাম। পাহাড়টী অল্পই উচু। কুয়াসা না হইলে দার্জ্জিলিং সহর এই পাহাড়ের উপর হইতে বেশ সুন্দর দেখায়। দার্জ্জিলিঙ্গে প্রায়ই Mountain fog (কুয়াসা) দেখিতে পাওয়া যায়। শাদা মেঘ কোন কোন পাহাড়ের গা হইতে উঠিতেছে। সময়ে সময়ে শাদা মেঘ ও কুয়াসা এত বেশি দেখা দেয় যে কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। মনে হয় সম্মুখে ও পার্শ্বে অনন্ত সমুদ্র। সমুদ্র নীল কিন্তু মেঘ শাদা। এই পাহাড়কে এ দেশের লোকেরা মহাকাল ডেরা বলে। কথিত আছে মহাকাল নামক এক ঋষি এই পর্ব্বতের একটী গহ্বরের ভিতর দিয়া তিব্বতে গিয়াছিলেন। সেই গহ্বর বা গুহাটী এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এই পাহাড়ে উঠিয়া একটী বসিবার স্থান আছে। তাহার পাশ দিয়া লোহার রেলিং দেওয়া পাথরের সিঁড়ি নামিয়াছে। অল্প নামিলেই গুহাটী দেখিতে পাওয়া যায়। এই পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ স্থানে দুর্জ্জয়লিঙ্গ নামে এক শিব আছেন। কেহ কেহ বলেন যে এই শিবের নাম হইতে দেশের নাম দার্জ্জিলিঙ্গ হইয়াছে। এখানে একটী কাঠের বাক্স আছে। বোধ হয় তাহাতে দূরবীক্ষণ প্রভৃতি যন্ত্র আছে। একটী পাহাড়ের মানচিত্র আছে। কোন্ পাহাড় কত উচ্চ তাহাও লিখিত আছে। শিবের সম্মুখে কিছু দূরে বৌদ্ধদিগের একটী চৈত্য আছে।

বৈকালে আমরা জলা পাহাড়ে বেড়াইতে যাই। এই পাহাড়ের উপরে

গোরাদের বারিক আছে। পাহাড়ে উঠিবার রাস্তার পার্শ্বে কুচবিহারের মহারাজার রাজভবন দেখিতে পাইলাম। পাহাড়ের উপর হইতে একটী রাস্তা গুম পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। আমরা এই রাস্তা ধরিয়া নামিলাম। জলা পাহাড়ের উপর হইতে সিঞ্চল পাহাড় দেখিতে পাওয়া গেল। সিঞ্চল এখানকার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ পর্ব্বত। আকাশ পরিষ্কার থাকিলে এই পাহাড হইতে 'গৌরীশঙ্কর' (Everest) দেখিতে পাওয়া যায়। শরৎকালে সিঞ্চল হইতে সূর্য্যোদয় একটী দেখিবার জিনিস। আমরা অকুলাণ্ড বোড দিয়া গুমে নামিয়া আসিলাম। গুম হইতে ফিরিয়া আসিতে রাত্রি হইয়া গেল। দার্জ্জিলিঙ্গের নিকটে আসিয়া সহরের দীপাবলী দেখিতে পাওয়া গেল। আলোগুলি এখানে ওখানে আকাশের তারার ন্যায় ফুটিয়া রহিয়াছে। দেখিতে অতি সুন্দর।

শুক্রবার দিন সকাল হইতে বৃষ্টি হয়। সকাল বেড়াইতে যাইতে পারি নাই। বৈকালে বাজার হইয়া Mall এ যাই। বাজারটী ছোট নয়। ষ্টেসনের নিকটেই বাজার। দেশী ও বিলাতী জিনিসের অনেকগুলি দোকান আছে। Tibetan Curios প্রভৃতি দোকানে, এ দেশের লোকেরা যে সকল দ্রব্য বিক্রয়ার্থে লইয়া আসে, তাহা ক্রয় করিয়া বিক্রয় করিবার জন্য রাখা হয়। এদেশের লোকেরা নানা প্রকার পশুচর্ম্ম, ভোজালি, মধু, মোটা গায়ের কাপড়, সুন্দর সুন্দর মৃতপ্রজাপতি প্রভৃতি বিক্রয় করিবার জন্য লইয়া আসে। বাঙ্গালীদের দুই একটী বড় দোকান আছে। তরকারির বাজারে কপি, কলাইশুটি, নানা প্রকার শাক, আলু, এক প্রকার পাহাড়ি সিম, কাঁচা আলুবোখারা প্রভৃতি প্রত্যহ বিক্রয় হয়। এখানে রবিবারে হাট বসে। কোন জিনিসই কলিকাতা অপেক্ষা এখানে বেশী সুলভে পাওয়া যায় না। ভুটিয়ারা দুধ বিক্রয় করে। তাহাদের পিঠে একটী করিয়া বড় বাঁশের চোং থাকে, তাহাতেই দুধ থাকে। বাজারে মুটে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহাদের মধ্যে অনেকে স্ত্রীলোক। ইহারা কপালে বাঁশের বোনা চওড়া ফিতা দেয় ('নেয়ার' দেয় না) তাহাদের পিঠে এক প্রকার লম্বা ঝুড়ি থাকে। এখানকার স্ত্রীলোকেরা ছোট ছেলেদের পিঠে বাঁধিয়া লইয়া যায়। বাজারে চাল ডাল প্রভৃতির কতকগুলি দোকান আছে।

শনিবার দিন গুমে বেড়াইতে যাই। এখানে ষ্টেসনের নিকট বৌদ্ধ ভুটানিদের একটী মঠ আছে। মঠের আকৃতি মন্দিরের মত নহে, বাড়ির মত কিন্তু একটী চূড়া আছে। উপাসনা গৃহের সম্মুখে বারান্দা। বারান্দার বাম দিকে একটী ছোট ঘর। উপাসনা গৃহে ঢুকিবার দরজার সম্মুখে বেদী। বেদীতে ধাতুনির্ম্মিত বৌদ্ধমূর্ত্তি। মূর্ত্তির সম্মুখে বৌদ্ধচৈত্য। সেইগুলির সম্মুখে এক সারি প্রদীপ। বার জন পুরোহিত পূজা করিতেছেন। প্রত্যে-কের সম্মুখে পুঁথি রাখিবার কাঠের চৌকী। পুঁথিগুলি খুব বড়। সকলে এক সঙ্গে মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছেন। মাঝে মাঝে এক সঙ্গে তিনবার করিয়া হাততালি দিতেছেন। প্রত্যেক পুরোহিতের নিকট কাঠের একটী করিয়া ঘটীর মত পাত্র আছে। পাত্রগুলিতে একটী করিয়া নল ও একটী করিয়া ছিদ্র আছে। একজন লোক গরম চা ঐ পাত্রে ঢালিয়া দিতেছে। পুরো-হিতেরা নল দিয়া টানিয়া মাঝে মাঝে চা খাইতেছেন। প্রত্যেক পুরো-হিতের হাতে মালা জড়ান আছে। এক জনের নিকট একটী শাঁখ আছে। মন্দিরে খুব বড় একটী কাঁসর আছে। বারান্দার বাঁ দিকের ঘরে একটী বড় কাঠের চোং আছে। চোংএর উপর দিকে একটী লোহার ডাণ্ডা আছে। চোংটীর দুই মুখই বন্ধ। ইহার নীচে দিকেও লোহার ডাণ্ডা আছে। এক জন স্ত্রীলোক দড়ি দিয়া নীচেকার ডাণ্ডা ঘুরাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে চোংটী ও তাহার মাথার উপরকার ডাণ্ডা ঘুরিতেছে। দুইটী ছোট ঘণ্টা ঝোলান আছে। উপরকার ডাণ্ডাটী সেই ঘণ্টা দুটীতে লাগিতেছে। অতি মধুর শব্দ হইতেছে। বাহিরে একজন লামা আছেন। তাঁহার হাতে একটী ছোট চোং। তিনি তাহা ঘুরাইতেছেন। আমরা এই মঠ দেখিয়া দার্জ্জিলিঙ্গে ফিরিয়া গেলাম।

রবিবার দিন সকালে হাট দেখিতে গেলাম। বেলা বাড়িলে হাটে বেশী লোক আসে। বাজারের রাস্তার দুই ধারে হাট বসে। হাটে নানা-প্রকার তরকারী, ভোজালি, প্রজাপতি, চা কাটিবার ছুরি, ওক ও চা গাছের লাঠি, বেতের লাঠি প্রভৃতি বিক্রয় হয়। বৈকালে Victoria Water-fall দেখিতে গেলাম। এই ঝরণাটীকে এ দেশের লোকেরা ‘কাকঝোরা’ বলে। স্যানিটেরিয়াম হইতে নীচে নামিতে লাগিলাম। পথের ধারে এখানকার

High School. এই বিদ্যালয়ে বাঙ্গালীরা ও এদেশের অধিবাসীরা পড়ে। এ দেশের অধিবাসীরা প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পারে না। ঝরণার নিকটবর্ত্তী স্থানটী অতি নির্জ্জন। প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া অনেক উপর হইতে ঝরণার জল বেগে পতিত হইতেছে।

সোমবার বার্চ হিল দেখিতে যাইলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বার্চ হিল লিবং রোডের ধারে। স্থানটি খুব নির্জ্জন। নানা প্রকার বৃহৎ বৃক্ষ এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার অধিকাংশ বৃক্ষ নানা প্রকার শৈবাল আচ্ছাদিত। পাহাড়ের উপরে বেড়াইবার রাস্তা আছে।

এইবার সহরের কথা কিছু বলিব। সহরে বিদ্যালয়, ঔষধালয়, হাঁস-পাতাল, জেল, কাছারি, স্যানিটেরিয়াম্, লাট সাহেবের বাড়ী, মহারাজা-দিগের প্রাসাদ প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর বাড়ী আছে। সহর হিসাবে দার্জ্জিলিঙ্গে দেখিবার বিশেষ কিছুই নাই। স্বভাবের উপর মনুষ্য যে কি আধিপত্য লাভ করিয়াছে ইহাই দেখিবার বিষয়। এখানে সকল রাস্তার আরম্ভে সাইন বোর্ডে সেই রাস্তার নাম এবং তাহার উপর যে সকল বাড়ী আছে সেইগুলির নাম লেখা আছে। সহরের অনেকগুলি ঝরণা অনেক দূর হইতে বাঁধাইতে হইয়াছে। কোন কোন পাহাড়ের স্থানে স্থানে পাথর দিয়া বাঁধাইতে হইয়াছে। এখানে ঘোড়া, রিক্স নামক এক প্রকার ঠেলাগাড়ী, ডাণ্ডী নামক যান, ভাড়া পাওয়া যায়। ডাণ্ডীতে একজন লোক বসে। তিনজনে ডাণ্ডী কাঁধে করিয়া লইয়া যায়।

এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। অসংখ্য পর্ব্বত, অসংখ্য জলপ্রপাত, নানা প্রকার বনস্পতি দেখিলে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের অসীম ক্ষমতা মনুষ্য উপলব্ধি করিতে পারে। এখানে মেঘের খেলা অদ্ভুত। আমরা এক দিনও একটী তারা আকাশে দেখিতে পাই নাই। পূর্ণিমার রাত্রে পূর্ণচন্দ্র দেখিতে পাইয়াছিলাম; কিন্তু তাহা মেঘমুক্ত নহে। এখানে বিদ্যুতের প্রভা দেখিতে পাওয়া যায় না। বজ্রের শব্দও শুনা যায় না। সূর্য্যের মাঝে মাঝে দেখা পাওয়া গিয়াছিল। সূর্য্যের উদয় বা অস্ত দেখিতে পাই নাই। আকাশে কোন দিনও লাল মেঘ দেখিতে পাই নাই।

ফিরিবার বেলা, আমরা মঙ্গলবার দিন ১০টার সময় গাড়ী চাপিলাম।

দার্জ্জিলিং ষ্টেসন ছাড়াইয়া আসিয়া আকাশের গায়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখিতে পাইলাম। তাহার নীচে ও উপরে মেঘ। কারসিয়ং ষ্টেসন ছাড়াইয়াই বহু দূরের শস্যশ্যামল সমতল ভূমি দেখিতে পাইলাম। এ দৃশ্য অতি সুন্দর। অনন্ত বিস্তৃত সমুদ্রের ন্যায় দেখাইতেছিল। দুইটী নদী সূক্ষ্ম রৌপ্যসূত্রের মত আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে। এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে নামিতে লাগিলাম। বৈকাল ৫টার সময় শিলিগুড়িতে আসিয়া পৌঁছিলাম।

চুঁচুড়া। শ্রীঅচ্যুতচন্দ্র সরকার।

আমাদের কথা।

দার্জ্জিলিঙ্গের পথে গুম্ ষ্টেসনের নিকট ভুটিয়াদিগের বৌদ্ধ মঠে, সেদিন অপরাহ্নে যখন বৈকালিক স্তব পাঠ শুনিতেছিলাম, তখন একটা কথা লক্ষ্য করিয়াছিলাম—বৌদ্ধ মঠাধারীদিগের স্তব গীতির সুর এবং তাল অনেকটাই ৺বৈদ্যনাথের নিকটস্থ সাঁওতালদিগের মত। তাল—পাহাড়ী-দের পটতাল। সুর কি তাহা ঠিক বলিতে পারিব না,—তবে একজন মুসলমান ভিক্ষুক, মঠের বাহিরে, অথচ অতি নিকটে বসিয়া মুলতানে গজলের মত গাহিতেছিল, ভিতরের বাহিরের সুরে বিশেষ গরমিল হইতেছিল না। যাঁহারা সাঁওতালের নাচ দেখিয়াছেন, গান শুনিয়াছেন, তাঁহারা—'কিন্ধিমা ঘেনা ঘেনা ঘা', এই বোলে মাদল বাজিতে ও এইরূপ তালে সাঁওতাল সাঁওতালনীকে নাচিতে গাহিতে শুনিয়াছেন, স্মরণ করিবেন। প্রায় ঠিক সেইরূপ তাল ও সুরে বৌদ্ধ পুরোহিতগণ সম্মুখস্থ বিরাট গ্রন্থ হইতে স্তব পাঠ করিতেছিলেন। কোথায় হিন্দু সভ্যতা পরিবেষ্টিত সাঁওতাল ভূমি,—আর কোথায় হিন্দুস্থানের সীমান্তের তিব্বত প্রান্তের দার্জ্জিলিং প্রদেশ? তবু সুরে তালে—এত মিল কেন? পাহাড়ের সহিত এই সুর তালের কোন সম্বন্ধ আছে না কি? বোধ হয় আছে। এই সকল দূর দেশের কথা ভাবিতে ভাবিতে, আমি নিকটের কথাও ভাবিতেছি—আমাদের বাঙ্গালির বা বঙ্গদেশের তাল বা ছন্দেরও ত বৈশেষিকত্ব আছে। আছে বৈ কি? ভাষা বল, গান বল, তাল বল, ছন্দ বল সকলই দেশ কাল পাত্র লইয়া

নিয়মের অধীন। অনিয়মে, বা অকস্মাৎ কোন কিছুই হয় না। আমাদের বাঙ্গালির ভাষায়, গানে, তালে, ছন্দে, আমাদের বাঙ্গালার জল বায়ুর ছাপ আছে, বৌদ্ধ যুগের, বা মুসলমান সময়ের, অথবা ইংরেজ অধিকারের ছাপ আছে, আর পাত্রের-বাঙ্গালির-আভিজাতিক ছাপ আছে; এই সমস্ত ছাপের গুণে বা রীতির ভঙ্গিতে, প্রাকৃতিক বলের তাড়নায়, বাঙ্গালির ভাষা গান তাল ছন্দ সকলই হইয়াছে। পোষাক পরিচ্ছদ রীতি নীতির কথা বলিতেছি না; নতুবা ঐ সকলে যে ঐরূপ ছাপ নাই—এ কথা কেহ বুঝিবেন না।

আর বঙ্গ শব্দে 'বাঙ্গাল' দেশ—এমনটাও কেহ বুঝিবেন না। বাঁকুড়া, বীরভূমি, বর্দ্ধমান, রঙ্গপুর, দিনাজপুর—এ সকলই বঙ্গদেশ। আসামে আমাদেরই অক্ষর; মিথিলায়ও এক শ্রেণীর মধ্যে এই বঙ্গাক্ষর; উড়িষ্যায় ছাঁদ বিভিন্ন হইলেও—সেও এক প্রকার বঙ্গাক্ষর; এইরূপ বঙ্গাক্ষর যে সকল দেশে প্রচলিত আছে—সেই সমস্ত ভূখণ্ডকে বঙ্গদেশ বলিতেছি।

সমগ্র হিন্দুস্থান মধ্যে এই বঙ্গদেশের এবং এই দেশবাসী বাঙ্গালি জাতির বৈশেষিকত্ব, অতি প্রাচীন কাল হইতে স্বীকৃত আছে।

নাগর, কায়তী প্রভৃতি যে সকল অক্ষর বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে বঙ্গাক্ষর অতি প্রাচীন। তন্ত্রের ধ্যানে এই অক্ষরমালারই (ত্রিকোণ কুণ্ডলীযুক্ত 'ক' ইত্যাদি) বর্ণনা। নেপালে ১৫০০ বৎসরের পুঁথিতে বঙ্গাক্ষর ব্যবহৃত আছে।

আলঙ্কারিকেরা গৌড়ীয় বলিয়া একটী প্রাচীন রীতির উল্লেখ করেন। এই রীতি সমাসবহুলা বলিয়া প্রসিদ্ধ। অষ্টাদশ প্রকার প্রাকৃতের মধ্যে গৌড়ী বলিয়া একটী ভাষার উল্লেখ আছে।

~~কাজেই বাঙ্গালার বিশেষত্ব বহু কাল হইতে স্বীকৃত~~।

গৌড়ীয় রীতি—সমাসবহুলা—তবে কি আমরা স্বভাবে বেশী জটীল? না আড়ম্বর প্রিয়?

বাঙ্গালার অক্ষরে কোণ বেশী। তবে কি আমরা বেশী খোঁচ ভালবাসি? না অক্ষরগুলি সুস্পষ্ট করিবার জন্ত আমরা অধিকতর কোণী করিয়াছি,—তবে কি আমরা সুস্পষ্টতা ভালবাসি?

বঙ্গাক্ষর সুস্পষ্ট, লিখিতে সুকর, এবং ধ্যান সঙ্গত বলিয়া বীজকবচের

উপযোগী। রাজা রাধাকান্ত দেব, জগতের জন্য অভিধান প্রণয়ন করিয়া, যে বুদ্ধিতে উহা বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত করেন, এই পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া, যদি সেই বুদ্ধি তাহার পর সময়ের সংগ্রহকার ও প্রকাশকগণের মধ্যে থাকিত, তাহা হইলে, ভারতের সর্ব্বসাধারণের গ্রাহ্য অক্ষরের জন্য আমাদিগকে কোন ভাবনাই ভাবিতে হইত না। বঙ্গাক্ষরের ন্যায়ত জয় হইত/ ~~সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালির গৌরব অধিকতর বর্দ্ধিত হইত।~~ আমরা হেলায় হারাইয়াছি, এখনও কত কি হারাইতেছি।

আমাদের গানের তালের, বা কবিতার ছন্দের যে বৈশেষিকত্ব তাহাও বোধ হয় আমরা হারাইতে বসিয়াছি।

বাঙ্গালির গানের বৈশেষিকত্বের বিশেষ পরিচয় বাঙ্গালির কীর্ত্তনাঙ্গে। উড়িষ্যায়, বা আসামে, যে কীর্ত্তনাঙ্গ, সে সমস্ত আমাদেরই—ঐ সকল দেশও বঙ্গদেশের মধ্যেই ধরিয়াছি। বঙ্গের বহুদূরে ব্রজমণ্ডলে বা দ্বারকায়, দক্ষিণে পাণ্ডুরপুরে, যে সকল কীর্ত্তনাঙ্গ আছে, সে সমস্তই বাঙ্গালা হইতে শ্রীচৈতন্যদেবের পর গিয়াছে। এই কীর্ত্তনাঙ্গ গীতি রীতি—জগতে অতুলনীয়। সুরের মোহিনীশক্তি কীর্ত্তনে যেমন আছে—এমন কোন গানে নাই। শোকের করুণ-রস-বিস্তারে বোধ করি, মহরমের মরসিয়া গান সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কিন্তু কীর্ত্তন সর্ব্বরসে সমান। শান্তি, আদি, করুণ, মধুর, বাৎসল্য, সখ্য, দাস্য সকল ভাবেই কীর্ত্তনের মোহিনী শক্তি অসামান্য। বাল বৃদ্ধ—ধনী দরিদ্র—জ্ঞানী অজ্ঞানী—ইতর ভদ্র—সর্ব্ব শ্রেণীর মিশ্রিত সংঘ মধ্যে যিনি কোন দিন কীর্ত্তনের লীলাখেলা দেখিয়াছেন, তাঁহাকে আমরা আর অধিক কি বলিব? আর যিনি বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালীর এই গৌরবের বিষয় প্রত্যক্ষ করেন নাই—তাঁহাকেই বা কি বলিয়া বুঝাইব? তিনি নিতান্ত অভাগ্যবান্, তাঁহার জন্য আমাদের দুঃখ হয়। তিনি একটু চেষ্টা করিলেই ভাগ্য পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। যে গানে,—করুণার ক্রন্দন, উল্লাসের উৎসাহ, প্রেমের পূর্ণতা, ভক্তির দ্রাবকতা—সমান ভাবে স্ফুরিত হয়, বড়ই দুঃখের বিষয়, সেই গানের আদর শিক্ষিত মধ্যে ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। প্রসিদ্ধ সম্পাদক শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ, সুযোগ্য শিক্ষক শ্রীযুক্ত রসময় মিত্র, রঙ্গপুরের উকীল ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত বরদা

প্রসাদ বাক্‌চি প্রভৃতি জন কতক খ্যাতনামা ব্যক্তি আজও কীর্ত্তনের চর্চ্চা করেন বলিয়া, এখনও কীর্ত্তন দাঁড়াইয়া আছে, নতুবা শিক্ষিতের কাছে কীর্ত্তনের কোন পরিচয়ই থাকিত না। দেশে হরিসভা অনেক আছে বটে, ভক্তিমান্ লোকেরও যে একেবারে অভাব হইয়াছে, এমন নহে; নব্য-সম্প্রদায়ের যুবকের মধ্যে যে কীর্ত্তন গানের একেবারে চর্চ্চা নাই, তাহাও নহে; তবু কীর্ত্তনের যে আদর আছে, এমন কথা বলিতে পারি না। কলিকাতার অনেক সভা সমিতিতে আদ্যন্তে সঙ্গীত হইয়া থাকে, কিন্তু কোথাও কীর্ত্তনাঙ্গ গান শুনিয়াছি, এমন মনে হইতেছে না। সুকণ্ঠ গায়িকায় সক্ করিয়া একটু আধটু চপের গান শিক্ষা করে, তাহাকেই অনেক ভদ্রলোক কীর্ত্তন বলিয়া জানেন, কিন্তু সে ত কীর্ত্তনের অপভ্রংশ মাত্র। জয়দেবের লম্বা তালের গান রীতিমত পত্তন দিয়া গাইতে পারেন, এমন গায়ক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়,—উচ্চ অঙ্গের আদর নাই বলিয়া। ঐ সকল গানের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কারিগরির আমি অতি অল্পই বুঝিতে পারি, কিন্তু যে টুকু বুঝি তাহাতেই মনে হয়, না জানি কতকালের সাধনার পর, গানে তাল ও রাগের ঐরূপ সম্মিলন ও স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। ঐরূপ অবয়ব হইয়াছে,—অন্তত আট শত বৎসর পূর্ব্বে—তবে এই বাঙ্গালি জাতি কত দিনই না এইরূপ সঙ্গীতের চর্চ্চা করিতেছে! কে বলিল, বাঙ্গালায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভদ্রলোকের বাস ছিল না?

কীর্ত্তনের সুরের বিশেষত্ব আর একটু বিশেষ করিয়া বলিব। পাঠক মহাশয় ক্ষমা করিবেন। বিশেষ সুরজ্ঞ পাঠকগণ। আমি তাঁহাদের শিক্ষার জন্য লিখিতেছি, এমন মূর্খ আমাকে মনে করিবেন না।

সুর মোটামুটি দুই প্রকার—খাড়া সুর, আর কোরাল বা ঘোরাল সুর। খাড়া বা সোজা সুর—ঐ পাপিয়া তুলিতেছে, উহু,—উহূ—উহূ—হূউ—[হঠাৎ সকাই পাপিয়া ডাকিতেছে, আমাদের দেশে আগে এমন বাদলের দিনে, এত পাপিয়া পূর্ব্বে শুনিতাম কি ?] আর ঐ ঘোরাল সুরে, গালভরা গলায় কৃষ্ণ গোকুলে বলিতেছে,—কু বলাম্, কো বলাম্—কু। খাড়া সুর-গুলির নাম দেওয়া হইয়াছে, সা, রি, গা, মা, পা, ধা, নি এবং উহাদেরই কোন কোনটীর কোমল বা তীব্র। আর ঘোরাল সুরগুলির নাম, মীড় বা

মূর্চ্ছনা। সেতারের একটী ঘাটে তারের উপর বামহস্তের আঙ্গুল দিয়া চাপিয়া সেই তারে দক্ষিণহস্তের একটী অঙ্গুলির মের্জাপ দিয়া টং করিয়া বাজাইলে, সেইটীকে খাড়া সুরের আওয়াজ বলা যায়; আর বামহস্তের আঙ্গুলটী কেবল চাপিয়া না রাখিয়া তারে চাপিয়া টানিয়া ধরিলে, এবং আঘাত করিলে যে ভাঁওও করিয়া আওয়াজ বাহির হয়, তাহাকে মীড় বা মূর্চ্ছনা বলে।

এই মীড় বা মূর্চ্ছনাই হিন্দু সঙ্গীতের ~~প্রাণ এবং~~ বিশেষত্ব। রাগ রাগিণীর যে সম্পূরণ, খাড়ব, ওড়ব বলিয়া ভেদ—তাহা এই মূর্চ্ছনা লইয়া। গলায় হোক, যন্ত্রে হোক, এই মূর্চ্ছনা সাধিতে না পারিলে, হিন্দু সঙ্গীত শেখা যায় না। সকল দেশের সঙ্গীতেই অল্প বিস্তর মূর্চ্ছনা আছে, হিন্দু সঙ্গীতে বড় বেশী আছে, এই জন্যই বলিতেছি মূর্চ্ছনাই হিন্দু সঙ্গীতের ~~প্রাণ ও~~ বিশেষত্ব। হারমোনিয়ম্ পায়ানোতে বিশেষ দক্ষ লোক নহিলে মূর্চ্ছনা কোন রূপ বাহির করা যায় না। সুতরাং হিন্দু সঙ্গীত শিখিতে হইলে, প্রথম হইতেই তানপুরার সঙ্গে গলা সাধা ভাল, তাহাতে ঘোরাল সুর শিক্ষা হয়।

বাঙ্গালির মধ্যে প্রথম পোলিসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট কলিকাতার জগদীশ নাথ রায়। তিনি বিশেষ শিক্ষিত ব্যক্তি এবং বিশেষ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। বঙ্গদর্শনের প্রথম বৎসর 'সঙ্গীত' শীর্ষক তিনটী প্রবন্ধ ধারাবাহিক লেখেন। প্রথম প্রবন্ধ হইতে একটু উদ্ধৃত করিতেছি:—"মনুষ্য কণ্ঠের সহজ সাত সুর, তাহার কোমল ও তীব্র এবং সুরাণী সকল গণিলে স্বভাবতঃ ২৪টী সুর হয়। এবম্প্রকার কল্পনা প্রসূত সুর সমুদায় কোন বাঁধা যন্ত্রেরই আয়ত্ত হইতে পারে না। দেশীয় গীতের জন্য হারমোনিয়াম্ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত করিতে হইলে, তাহাতে স্বভাবত (প্রত্যেক গ্রামে) ২৪টী সুর রাখা উচিত। তাহা হইলে তদ্দ্বারা দেশীয় গীত বাদিত হইবার সম্ভাবনা। য়ুরোপীয় যন্ত্রে (প্রত্যেক গ্রামে) কেবল ১২টী মাত্র সুর হয়, অতএব তাহাতে দেশীয় গীতের দশা নারদের ত্রিতন্ত্রী নিঃসৃত ভগ্নাঙ্গ রাগ রাগিণীর দশার ন্যায় হইয়া উঠে।"

এই মূর্চ্ছনাই হিন্দু সঙ্গীতের বিশেষত্ব। অন্য সঙ্গীতেও মূর্চ্ছনা আছে; তবে হিন্দু সঙ্গীতে বেশী বেশী আছে। তাহার মধ্যে আবার কীর্ত্তন সঙ্গীতে অত্যন্ত বেশী আছে।

এই গেল সুরের কথা—এখন তালের কথা মোটামুটি কিছু বলিতে হইতেছে। গানে যেমন তাল, পদ্যে তেমনই ছন্দ। যেমন লঘু, গুরু বা মাত্রাভেদ লইয়া তাল, তেমনিই লঘু, গুরু বা মাত্রাভেদ হইয়া ছন্দ; তালে যেমন বিরাম আছে, ছন্দে সেইরূপ যতি বা বিরাম; তালে যেমন লয় বা কাল আছে, ছন্দেও সেইরূপ কাল বা লয় আছে।

প্রথমেই বলিয়াছি, পাহাড়ীদের তাল, প্রায়ই পটতাল—'কিন্ধিয়া ঘেনা ঘেনা ঘা'। সেইরূপ অল্প সংখ্যক অক্ষরের ছন্দ লইয়া আদিমকালের কাব্য হইয়া থাকে। আমরা প্রাকৃত ভাষার কথা কহিতেছি; সংস্কৃতের নহে, বৈদিকী ভাষার একেবারে নহে। যাঁহারা বেদ বা বৈদিকী ভাষা, বা বৈদিক মন্ত্র—নিত্য বলিয়াছিলেন, তাঁহারা অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী,—আর যাঁহারা বেদ চাসার গান বলেন, তাঁহারা নিতান্ত স্থূলদর্শী। আমরা বেদের ভাষা বা ছন্দ লইয়া কোন কথা বলিতেছি না; প্রাকৃত ভাষার কথাই বলিতেছি। প্রাকৃত ভাষায় প্রথমে ছোট ছোট ছন্দ দেখা যায়।

দীনেশ বাবু বহু গবেষণা করিয়া বঙ্গের আদি যুগের অনেকগুলি ডাকের কথা এবং খনার বচন সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহার প্রায় সকলগুলিই ছোট ছোট ছন্দের। এইখানে দুই চারিটী উদ্ধৃত করিব।

দুষ্টা নারী।

(১)

ঘরে আখা, বাহিরে রাঁধে।
অল্প কেশ, ফুলাইয়া বাঁধে॥
ঘন ঘন চায়, উলটি ঘাড়।
ডাক বলে—এ নারী ঘর উজাড়॥

(২)

নিয়ড় পোখরি, দূরে যায়।
পথিক দেখিয়ে, আউড়ে চায়।
পর সম্ভাষে বাটে থিকে।
ডাক বলে, ঘরে না টিকে॥

শিষ্টা গৃহিণী।

রাঁধে, বাড়ে, গায়ে না লাগে কাতি। (কালি)
অতিথ দেখিয়া মরে লাজে।
তবু (ব্যস্ত) তার পূজার সাজে॥
সুশীলা, শুদ্ধ বংশে উৎপত্তি।
মিঠা বোল, স্বামীতে ভকতি॥
রৌদ্রে কাঁটা কুটায় রাঁধে।
খড় কাট বর্ষাকে বাঁধে॥
কাঁখে কলসী পানীকে যায়,
হেট মুণ্ডে কাহকো না চায়॥
যেন যায়, তেন আইসে।
বলে ডাক, গৃহিণী সেই সে॥

এইরূপ নীতি কথা, গৃহস্থালির কথা, এবং চাস বাসের কথা লইয়া ডাকের কথা। তিব্বতে 'ডাকার্ণব' পুস্তকে নাকি এই সকল সংগৃহীত আছে। খনার বচনে এইরূপ কথাও আছে, উপরন্ত জ্যোতিষের আর্য্যা আছে।

বাঙ্গালার কাব্যের প্রধানতঃ দুই ভাগ। ছড়া ও গান। ডাকের কথা। খনার বচন—কেবল ছড়া মাত্র। এই প্রাচীন সময়ে গানে কিরূপ ছন্দ ব্যবহৃত হইত তাহা আমরা বলিতে পারি না।

দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন—"তিরুমলায় উৎকীর্ণ শিলালিপি পাঠে জানা যায়, মহারাজ রাজেন্দ্র চোল বাঙ্গালা দেশের রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজয় করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্র চোল ১০৬৩ হইতে ১১১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন। গোবিন্দচন্দ্রের পিতা মাণিকচাঁদ। এই মাণিকচাঁদের গান গ্রিয়ার্সন সাহেব প্রথমে ছাপান।" তৎপূর্ব্বের কোন বাঙ্গালা গান আমরা জানি না। সে গানও ছড়ার মত বটে, তবে নিশ্চয়ই সুরে তালে গীত হইত। আর

"তুড়্ তুড়্ করিয়া ময়না হুঙ্কার ছাড়িল।"

এইরূপ পংক্তিগুলি বার বার থাকাতে মনে হয়—ওগুলি গানের ধুয়া হইবে।

মাণিকচাঁদের গান হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল।

না যাইও, না যাইও রাজা! দূর দেশান্তর।
কারে লাগি বান্দিলাম শীতল মন্দির ঘর।
বান্দিলাম বাঙ্গলা ঘর নাহি পড়ে কালি।
এমন বয়সে ছাড়ি যাও, আমার বৃথা গাবুরাণী *।
জীয়ব জীবন ধন আমি (কন্যা) সঙ্গে গেলে।
রাধিয়া দিমু অন্ন, ক্ষুধার কালে।
পিপাসার কালে দিমু পানী।
হাসিয়া খেলিয়া পোহামু রজনী।

গ্রীসকালে বদনত দিমু দণ্ড পাথার বাও।
মাঘ মাসে শীতে ঘেষিয়া রমু গাও॥

পুত্র 'গোবিন্দচন্দ্রের গান'ও প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে অনেক আধুনিক কথা মিশ্রিত হইয়াছে।

গোবিন্দচন্দ্রের গানের নমুনা।

অভাগী দুনারে রাজা সঙ্গে করি লহ।
দেশান্তরে যাব আমি, কর অনুগ্রহ।
তুমি যোগী হইবে, আমি হইব যোগিনী।
রান্ধিয়া বিদেশে যোগাব অন্ন পানি।
বসিয়া থাকিও তুমি বনের ভিতরে।
আনিব মাগিয়া ভিক্ষা আমি ঘরে ঘরে॥

* * *

নারী পুরুষ দুই হয় এক অঙ্গ।
শিব বটে যোগীয়া, ভবানী তার সঙ্গ॥

* * *

খসাইয়া ফেলে হায় কেয়ুর কঙ্কণ।
অভিমানে দূর করে যত আভরণ॥

---

* গাবুরাণী = যৌবন।

পুঁছিয়া পেলিল সব সিঁতাব সিন্দুর।
নাকের বেসর পেলে, পায়ের নূপুর॥
রাজার চরণে পড়ে জড়ায়ে কুন্তল।
মোরা সবে যাব রাজা দেশান্তরে চল॥

বাঙ্গালায় উজ্জ্বল রসের করুণ গীতি, দেখা যাইতেছে,—সেই কালেও বেশ সুন্দর ভাবে ফুটিয়াছিল।

এই সকল গীতি কাব্য পয়ারে রচিত; বাঙ্গালায় পয়ার কতকাল ধরিয়া আছে, তাহা ঠিক বলা যায় না, খনার বচন বা ডাকপুরুষের কথা যেমন ছিল, সেই সময়ে সর্ব্বরূপ পয়ারও ছিল বলিয়া বোধ হয়। তবে ওই-গুলি ছোট ছন্দে রচিত বলিয়া, অগ্রবর্ত্তী—একথা বলিতেও আমরা নারাজ নহি।

যে সময়ে মাণিকচাঁদ ও গোবিন্দচন্দ্র বাঙ্গালার এক দেশে রাজা—সেই সময়ে বঙ্গে সেন রাজাদিগের রাজত্ব চলিতেছে। এই সেন রাজাদিগের শেষ রাজার সময়ে শ্রীজয়দেব ঠাকুর। জয়দেবের গীত-গোবিন্দে রাগ অঙ্গের ভজনের, এবং সুরের ও তালের কায়দার—এক রূপ চরমোৎকর্ষ হইয়াছিল বলিলেই হয়; অল্প সময় মধ্যে এইরূপ পরিণতি হয় নাই। বহু-কালব্যাপী অনুশীলনে হইয়াছিল। সুতরাং মাণিকচাঁদ প্রভৃতির সময়ে যে শ্রীকৃষ্ণ উপাসনা অল্প পরিমাণ ছিল, বা ম্রিয়মান হইয়াছিল, এমন কথা আমরা বুঝিতে পারি না; তাহার বিপরীতই বুঝি।

সকল পণ্ডিতেই বলিয়াছেন যে বাঙ্গালা ভাষা ভারতের অন্য সকল প্রাকৃত ভাষা অপেক্ষা সংস্কৃতের বড় কাছা কাছি। সুতরাং বাঙ্গালা প্রধানত অনার্য্য নিবাস ছিল, এ কথায় কোন মূল্য নাই। আবার জয়দেবের ভাষা বাঙ্গালা ভাষার এত কাছাকাছি, যে জয়দেবের সময়ে বাঙ্গালা ভাষা সাঁও-তালির মত একটা বুলি ছিল, তাহাও মনে করিতে পারা যায় না; বাঙ্গালা সেরূপ বুলি থাকিলে, সংস্কৃত তাহার কাছাকাছি হইতে যাইবে কেন? বাঙ্গালায় মুসলমান আসিবার বহুপূর্ব্বে এই দেশ সুসভ্য অধিবাসীর সুশৃঙ্খল জনপদ ছিল; তাহারা সুর-তাল-লয়ে গানের বিশেষ অনুশীলন করিত।

কান্যকুব্জ হইতে ~~যদি কিছু পূর্ব্বে~~ ব্রাহ্মণ কায়স্থের কতক কতক আসিয়া

~~থাকেন, তাঁহারা কতক কতক মাত্র—কেননা~~ বাঙ্গালার কীর্ত্তনাঙ্গ গান~~ক~~-কনোজিয়ার নহে। এ ~~যে বাঙ্গালির~~ জিনিস বাঙ্গালায় উঠিয়াছিল, বাড়িয়াছিল, এবং জয়দেবের সময় বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল,—এরূপ উৎকর্ষ যে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অনুচরবর্গের ক্রমাগত সোৎসাহ অনুশীলনেও সে উৎকর্ষ ছাড়াইয়া অদ্যাপি বাঙ্গালার কীর্ত্তন উঠিতে পারে নাই।

শ্রীমৎ আচার্য্য প্রভুর খেতুরের মহা মহোৎসবে যে অপূর্ব্ব কীর্ত্তনাঙ্গের সৃষ্টি হয়, এবং রেণেটি বা রাণীহাটি বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই অদ্ভুত সুর লহরীর আমরা অবমাননা করিতেছি না, আমরা কেবল মাত্র বলিতেছি গীত-গোবিন্দের রসরাগ তাল মান কীর্ত্তনাঙ্গের এক দিকের চরমোৎকর্ষ।

আমরা বাঙ্গালি হইয়া বাঙ্গালিকে এবং বাঙ্গালা দেশটীকে বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি মাত্র। আমরা বলি, যাঁহারা মনে করেন, হাজার বার শ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা ছোট নাগপুরের মত অসভ্য অধিবাসী পূর্ণ ছিল, তাঁহারা ভ্রান্ত; তাহা হইলে ৮০০ বৎসর পূর্ব্বে গীতগোবিন্দ হইত না, আর কনৌজ হইতে ব্রাহ্মণ উপনিবেশ আসিয়া ওরূপ তান-লয়পূর্ণ গীতি কাব্যের সূচনাও করিতে পারিত না।

যেমন হিন্দু সঙ্গীত পৃথিবীর অন্য সঙ্গীত অপেক্ষা বিশেষরূপে অধিকতর মূর্চ্ছনাপূর্ণ, বঙ্গের কীর্ত্তনাঙ্গ সেইরূপ ভারতের অন্যরূপ সঙ্গীত অপেক্ষা বিশেষরূপে অধিকতর মূর্চ্ছনাপূর্ণ। কীর্ত্তনে গড়ানে সুর এত বেশী যে ভাল খেয়ালী বা ধ্রুপদীকেও কীর্ত্তন শিখিতে গেলে কষ্ট পাইতে হয়, সময় লাগে।

সুরে যেমন গীতগোবিন্দের চরমোৎকর্ষ, তালে ছন্দেও সেইরূপ।

পদ্যমাত্রকেই পয়ার বলা হইত। তবে গানের বেলা পয়ার কথাটা লিখিত হইত না; তাল এবং সুর লেখা থাকিত। ছড়াতে পয়ার বলিয়া চিহ্ন থাকিত; ডাকের কথার বা খনার বচনের ছড়াগুলি ছোট ছন্দের পয়ার বটে। প্রকৃত পয়ার মাণিকচাঁদের গানের ছড়ায় আমরা সর্ব্বপ্রথম দেখিতে পাই। জয়দেবে এই পয়ার পাওয়া যায়। বাঙ্গালা পয়ারের জোর ছিল বলিয়াই পয়ার জয়দেবের সংস্কৃতে স্থান পাইয়াছে। জয়দেবের ভাষা প্রাকৃত ও সংস্কৃতের মধ্যবর্ত্তিনী।

জয়দেবের পয়ার—

সরস মসৃণমপি মলয়জ পঙ্কং।
পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কং॥
দিশি দিশি কিরতি সজল কণজালং।
নয়ন নলিনমিব বিদলতি নালং॥
নয়ন বিষয় মপি কিশলয় তল্পং।
গণয়তি বিহিত হুতাশ বিকল্পং॥
ত্যজতি ন পাণি- তলেন কপোলং।
বালশশিনমিব সায়মলোলং॥
হরিরিতি হরিরিতি জপতি সকামং।
বিরহ বিহিত মরণেব নিকামং॥

এইটী চতুর্থ সর্গের গীতাংশ। এইরূপ ষষ্ঠের, সপ্তমের, নবমের এবং একাদশের অনেকগুলি গীতে দৃষ্ট হইবে। সকল স্থলেই দুই চরণ, শেষে মিল, চরণের মধ্যে যতি, এবং তের চৌদ্দ বা পনর অক্ষরে এক এক চরণ। দুই চরণে ২৬ হইতে ৩০ অক্ষর। জয়দেবে ~~তিন চারিটী~~ ত্রিপদীর গান আছে। একটী ভঙ্গ বলিতে হয়ঃ—

দিনমণি মণ্ডল খণ্ডন ভবখণ্ডন মুনিজন মানস-হংস ইত্যাদি—

ধীর সমীরে, যমুনা তীরে বসতি বনে বনমালী।—আর একটী-তৃতীয়টী—

ইহ রসভণনে কৃত হরিগুণনে মধুরিপু পদসেবকে
কলিযুগচরিতং ন বসতু দুরিতং কবি-নৃপ জয়দেবকে।

আর একটী সেই প্রসিদ্ধ—

স্মরগরল খণ্ডনং মমশিরসি মণ্ডনং দেহি পদ পল্লবমুদারং

এ কথা যদি ঠিক হয়, যে রসের পরিপোষণের জন্য ছন্দের বিস্তৃতির প্রয়োজন তাহা হইলে, সভ্যতার বৃদ্ধি সহকারে রসগ্রাহিতা বৃদ্ধি পায়, রসের পরিপোষণার্থ ছন্দেরও অবয়ব বৃদ্ধি পায়। শেষের উদ্ধৃত চরণে ২৬টী অক্ষর আছে; শ্লোকটীতে সুতরাং ৫২ অক্ষর। কিন্তু কেবল অক্ষর দেখিলে হয় না, ছন্দও বড় হওয়া চাই, সঙ্গে সঙ্গে তাহার মাত্রা বড় হওয়া আবশ্যক

এবং লয় বিলম্বিত হওয়া চাই। নিম্নে ভারতচন্দ্রের ছন্দ, মাত্রা এবং লয় লক্ষ্য করিবেন ঃ—

প্রভাত হইল বিভাবরী,—
বিদ্যারে কহিল সহচরী ;—
"সুন্দর পড়েছে ধরা," শুনি বিদ্যা পড়ে ধরা ;
সখী তুলে ধরাধরি করি।

৪৬ অক্ষরে ছন্দ, দীর্ঘ স্বর অনেকগুলি আছে ; বিলম্বিত লয়ে পাঠ করিলে, করুণ রসে ভোরপুর হয়।

মধুসূদনের মেঘনাদ বধে, মেঘনাদের মৃতদেহ সমক্ষে শ্মশানে রাবণের শোকোচ্ছ্বাস পাঠ করিবেন। ছন্দ সাধারণ পয়ার হইলেও, বিলম্বিত লয়ে পাঠ কবিলে, সেইটী কিরূপ চিত্তদ্রাবক শোক গাথা ! অমিত্রাক্ষর ছন্দের গুণ এই যে, সাধারণ ছন্দে কবিতা আবদ্ধ থাকিলেও সে আপনার ইচ্ছামত চলিতে, উঠিতে নামিতে পারে,—ছন্দ ২৮ অক্ষবের, কিন্তু শত অক্ষরের পর পূর্ণ চ্ছেদ বা আকাঙ্ক্ষা শেষ হইলেও ক্ষতি হয় না। শোক গীতিতে এইরূপ প্রলম্বিত সংসর্পণ অতি প্রয়োজনীয়।

গীতগোবিন্দে তালের বিস্তৃতি অতি অদ্ভুত ! দশকোশী ধরা গান বিলম্বিত লয়ে মহা ভাবুকের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ শেষ করে ; তালের গতিতে ভাবকে কুঞ্চিত বা সংযত হইতে হয় না।

জয়দেবের প্রসিদ্ধ "বদসি" গীতি এই কথার জাজ্বল্য উদাহবণ।

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্ত-রুচি-কৌমুদী হরতি দরতিমিরমতি ঘোরং।
প্রিয়ে চারুশীলে ! মুঞ্চময়ি মানমনিদানং ॥

যাঁহারা জয়দেবের 'বদসি' বড় তালে গীত হইতে শুনিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন,—সাঁওতালের বা ভুটিয়ার "কিদ্ধিয়া ঘেনা ঘেনা ঘা" হইতে ঐ তালের কায়দা—কত কালের সাধনায় লব্ধ হইয়াছে। সেই সাধনার অসাধারণ ফল এখন কি ঔদাসীন্তে, অবহেলায় নষ্ট করিতে হইবে ? তোমরা স্বদেশী হইয়াছ, এই কি দেশের প্রতি মমতা ? জগতের অতুল্য স্বদেশী নিধি হেলায় হারাইবে ?

কদমতলা, চুঁচুড়া। শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

সৈয়দ-চাঁদা।

বিষয় কর্ম্মে লিপ্ত, আদালত বিচরণকারী, হুগলি জেলাবাসী বর্ষীয়ানের পক্ষে—হুগলির "সইচ্চাঁদের ঘাট" না জানা একটা গুরুতর অপরাধ, সন্দেহ নাই। কি করিয়া এই ঘাটের নামান্তর, রূপান্তর ও ভাবান্তর হইল তাহা আবার জানিবার কথা। সইচ্চাঁদের সিন্নির সৃষ্টি কি করিয়া হইল তাহা জানিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? হুগলির ইতিহাস লেখকগণের মধ্যে আধুনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে দুই এক জন স্মিথ সাহেবের ঘাটের কথা উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাও ধারাবাহিক রূপে নহে। আমাদের পূর্ণিমার 'হুগলি কাহিনী' লেখক "সইদ চাঁদ" সম্বন্ধে কিছুই লেখেন নাই বলিয়া আমার মনে হয়। এই সকল কারণে ও এই দারুণ বৃষ্টির সময় আমি সৈয়দচাঁদকে সেলাম করিয়া লেখনী সঞ্চালন আরম্ভ করিলাম। ভরসা করি পাঠক পাঠিকা পাঠে আনন্দ পাইবেন। অন্ততঃ 'আষাঢ়ে' গল্পের আনন্দ—স্থির নিশ্চয়।

হুগলিতে কাছারী ছিল। জমিদারী কাছারী নহে ইংরেজের বিচারালয়—যেখানে দেওয়ানী ফৌজদারী, কালেক্টরীর মোকদ্দমা উভয়পক্ষের শুনানি হইয়া "রায়" প্রকাশ হয়। আমার একজন বন্ধু বলেন কাছারী শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ—কাছা + অরি = কাছারি। লিখিবার সুবিধা বলিয়া কেহ কেহ দীর্ঘ ঈকার ব্যবহার করেন। হাঁসিবেন না—নজীর আছে—"পরিবর্ত্তন" অক্ষয় বাবুর হাতেই "পরীবর্ত্তন" হইয়াছে। বিচারালয় কাহার শত্রু?—অর্থাৎ যেখানে পাণ্টালুন, ইজের পায়জামা পরিয়া যাইতে হয়—ইহাদের কাহারও কাছা নাই।

ইংরেজী লেখক হেল্‌প্‌স্‌ বলিয়াছেন যে Man nature is the same as boy nature. এ কথার যাথার্থ্য, আমি পদে পদে অনুভব করিয়াছি ও বর্ত্তমানে করিতেছি ও নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে করিব। মানুষ—নাম রাখিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত—কেহ ভাল কাজ করিয়া, কেহ বা মন্দ কাজ করিয়া। কোন কাজটীকে আবার দশে মন্দ বলেন শতে ভাল বলেন—এইরূপ মতভেদ হয়। সে যাহা হৌক একজন ছোট লাট হুগলি দেখিতে আসিলেন। তিনি হুকুম

দিলেন যে হুগলির কাছারী চুঁচুড়ায় উঠিয়া যাইবে। কেন? না, গোয়াল ঘরে কাছারী করা ভাল দেখায় না, চুঁচুড়ায় বৃহৎ গোরাবারিক পড়িয়া আছে সেইখানে কাছারী উঠিয়া যাইবে। রাজার হুকুম! তল্‌পী তল্‌পা লইয়া সকলেই চুঁচুড়ায় ছুটিলেন। ১৮৯৭ সালের ১৫ই জুন সোমবার প্রথম চুঁচুড়ায় কাছারী খোলা হইল। শনিবার দিন—একাদশীর দিন—মহরমের মাটীর দিন ভয়ানক ভূমিকম্প হইল, কিন্তু তাহাও ঠেকাইতে পারিল না। বারিকের একাংশ ভূকম্পে পড়িয়া গিয়াছিল—কিন্তু, তাহাতেও রক্ষা হইল না। জজ ব্রাড্‌বরি রাজাজ্ঞা মান্য করিলেন। শত বৎসরের উপর ধরিয়া যে হুগলিতে কাছারী হইতেছিল সে হুগলি মাটি হইল।

হুগলির পুরাতন কাছারী বাটী ১৮০৪ সালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সে বাটী পড়িয়া রহিল না। গোবাবারিকে যে নর্ম্মাল বিদ্যালয় ও মডেল বিদ্যালয় (পরে ট্রেণিং স্কুল), নর্ম্মাল স্কুলের পুস্তকাগার, ছাত্রাবাস প্রভৃতি ছিল; সেই সকল উঠিয়া আসিল—পুরাতন কাছারী বাটীতে। এখনও আছে। আরও আছে—স্কুল সমূহের পরিদর্শকের আপিষ। ইঁহাদেরও বড় কর্ত্তা ছোট কর্ত্তা আছেন। তাঁহাদেরও অবস্থিতি এইখানে। কাছারীর হৈ হৈ শব্দময় অশান্তিপূর্ণ হুগলি, মিথ্যা কথার ঝুড়ি মাথা হইতে ভাগীরথীর জলে ফেলিয়া দিয়া শান্তিময় টোল-চৌবাড়ীতে পরিণত হইল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে হুগলি যে শান্তি উপভোগ করিতে বসিয়াছে সে শান্তি নাগরিক শান্তি নহে তাহা স্বাভাবিক, সুতরাং হুগলি শীঘ্র একটী বনে পরিণত হইবে। দেখা যাউক কাহার কথা ফলে।

"সৈয়দ-চাঁদের ঘাট"—এই নাম কেমন করিয়া হইল পরে বলিতেছি। কিন্তু এই সৈয়দ চাঁদের ঘাটেরই আরও একটী নাম হইয়াছে—সেটী হইতেছে স্মিথ সাহেবের ঘাট বা সংক্ষেপে "স্মিথ ঘাট"। মিউনিসিপাল আপিষে খাতা পত্রে এই ঘাট Smith's Ghat বলিয়া পরিচিত। স্মিথ সাহেব বড় বেয়োকা হাকিম ছিলেন তাঁহার নামে একটা ছড়া আছে—ছোট লোকে বলিত—

ইস্‌মিথ সাহেবের ঘানী।
অদ্ধেক তেল অদ্ধেক পানী॥

এই যে "পানী" শব্দ ইহার অর্থ চক্ষুজল বা অশ্রু। স্মিথ সাহেব সৈয়দ

চাঁদের ঘাটের ইতিহাস বোধ হয় জানিতেন তাই ঐ স্থানে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া একটী পরম রমণীয় ঘাট প্রস্তুত করাইলেন। টাকাটা যোগাইল গৌরী সেন অর্থাৎ ভাস্তাড়ার এককড়ি সিংহ প্রমুখ জমীদারগণ। কত টাকা চাঁদা উঠিয়াছিল জানিবার উপায় আছে, কিন্তু জানিয়া আর লাভ কি? কালক্রমে ঘাটের জল সরিয়া তফাতে যাওয়ায় ঘাটটী একটী বিড়ম্বনার মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল। ময়মনসিংহের রাণী বামাসুন্দরী এখানে গঙ্গাবাসিনী হইয়াছিলেন। তাঁহার দত্ত টাকায় ঘাটের সুমুখের মাটিটা কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়ায় গঙ্গার জল আবার ঘাটের নব আবিষ্কৃত (পূর্ব্বে মৃত্তিকাগত) ঘাটের ধাপে আসিয়া উপস্থিত হয়। আবার কতকটা বুজিয়াছে। এখন কেবলমাত্র বর্ষাকালে ঘাটের ধাপে গঙ্গার জল পাওয়া যায়।

সৈয়দ চাঁদের ঘাটের (বা স্মিথ ঘাটের) মাহাত্ম্য আছে। কিম্বদন্তী বলেন এই ঘাটে বা নিকটবর্ত্তী স্থানে কাহাকেও কুমীরে ধরে না। ফকীরের মাহাত্ম্য কুমীরেরাও স্বীকার করে।

বর্ত্তমান পোষ্ট আপিষ বা ডাকঘরের সাম্‌নে চক রাস্তার উপর ডাহিন দিকে একটী স্থানে একজন তেজঃপুঞ্জ ফকীর বসিয়া থাকিত। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় আজ কাল নহে তাহা শতাধিক বৎসরের উপরের কথা। ফকীর কোথা ছিল কেহ জানিত না—কে আনিল তাহা কেহ জানিত না। কেনই বা আসিল, উদ্দেশ্যই বা কি, তাহা কেহ জানিত না। তিনি সর্ব্বদা বসিয়া জপ করিতেন। দেখিলে ভয় হয়—তাঁহার চক্ষু, তাঁহার জটা, তাঁহার পোষাক। ফকীর কাহারও সঙ্গে কথা কহিতেন না। এ কথা ঠিক কি না পরে বিবেচনা করা যাইবে।

বর্ত্তমান এমামবাড়ীর সন্নিকট একটী স্থানে একাকিনী বাস করিত একটী ময়রার মেয়ে। তাহার নাম "চন্দ্রা" লোকে কিন্তু তাহাকে "চাঁদা" "চাঁদা" বলিয়া ডাকিত। ময়রাণী কাহারও সঙ্গে মিশিত না আপনার ভাবে ভোর হইয়া থাকিত, বিড় বিড় করিয়া কি বকিত, জিজ্ঞাসা করিলে কাহাকেও জবাব দিত না। সে যে একেবারে লোকের সহিত কথা কহিত না এমন নহে, আবশ্যক হইলে নিজ প্রয়োজন বশত লোক জনের সঙ্গে খুব কথা কহিত।

ফকীরের আগমনের কিছু দিন পরে দেখা গেল চাঁদা ময়রাণী ফকীরের কাছে আসিয়া বসিতে লাগিল। সে নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী লইয়া ফকীরের কাছে আসিত। খাদ্য সামগ্রী ফকীরের সুমুখে ধরিয়া দিয়া নিজে তফাতে বসিত যতক্ষণ না ফকীর চক্ষু খুলিত ততক্ষণ চাঁদা ফকীরের মুখ পানে চাহিয়া চাহিয়া বসিয়া থাকিত। তাহাতে কোন কোন দিন সমস্ত দিন কাটিয়া যাইত।

ফকীর ধ্যানমগ্ন—চাঁদা সুমুখে বসিয়া—ফকীরের বদনমণ্ডলে ধীর স্থির সংলগ্ন দৃষ্টি—খাবার লইয়া বসিয়া আছে—এ দৃশ্য নিত্য দেখা যাইত। ক্রমে নিজের খাবারগুলি আনিয়া চাঁদা ফকীরকে দিতে আরম্ভ করিল। দিনের পর দিন মাসের পর মাস বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল। সৈয়দ ও চাঁদার ব্যবহারও সমভাবে চলিয়াছে। ফকীরের কাছে লোকে যাহা কামনা করে তাহা প্রাপ্ত হয়। ক্রমে ফকীরের যশ দেশরাষ্ট্র হইল। ফকীরের সঙ্গে সঙ্গে চাঁদার নামও জাহির হইল। লোকে চাঁদাকে সমান ভক্তি করিতে লাগিল।

* * * * *

একদিন প্রাতঃকালে অতি প্রত্যুষে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া ফকীর স্ব-স্থানে আসিয়া বসিলেন। যেন বড়ই আনন্দিত। হা হা করিয়া বার বার হাস্য করিলেন, তার পর কোমর বাঁধিয়া এক ছুটে আসন-স্থান হইতে গঙ্গা-তীরে আসিয়া—এখন যেখানে ঘাট—সেই স্থানে আসিয়া ফকীর পুঙ্গব লাফাইয়া জলে পড়িলেন। ঐ যে ডুবিলেন সেই ডুবিলেন—আর উঠিলেন না। কাতার দিয়া লোক দাঁড়াইয়া গেল। সকলের মুখে ঐ কথা। কত অনুসন্ধান হইল কেহ খুঁজিয়া পাইল না। আজ ফকীরের আসন শূন্য।

আজ ফকীরের আসন শূন্য। আজ চাঁদার ফকীর সৈয়দের আসন শূন্য। রাস্তার লোক দাঁড়াইয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশে শূন্য আসন দেখাইয়া দিতেছে। যাহার প্রাণে যাহা আসে সে তাহা বলিতেছে।

যথা সময়ে—দুই প্রহরের পর, থালায় খাবার সাজাইয়া—লোটায় জল লইয়া চাঁদা ময়রাণী আসিয়া ফকীরের আসন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে দেখিল——ফকীরের আসন শূন্য।

খাবার লইয়া বাত্যাহত কদলীর ন্যায় চাঁদা ময়রাণী বসিয়া পড়িল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে, তাহার জিহ্বা ও ওষ্ঠ শুষ্ক। কাষ্ঠ চক্ষে জল নাই।

একজন পথিক বলিল "চাঁদা তোর ফকীর আজ সকালে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়াছে।"

কথা শুনিয়া চাঁদা চমকাইয়া উঠিল। উঠিয়া দাঁড়াইল। আবার বসিল আবার দাঁড়াইল। নিমেষ নিমেষ মধ্যে ইতি কর্ত্তব্য স্থির হইল। চাঁদা খাবার ও লোটা লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ধীর গম্ভীর পদবিক্ষেপে চাঁদা ৬ ভাগীরথীর কূল সন্ধানে চলিল।—সঙ্গে শত শত লোক কৌতুহলী হইয়া চলিল।

চাঁদা ভাগীরথী তীরে উপস্থিত হইয়া কাহাকে প্রণাম করিল—দুইবার প্রণাম করিল। তার পর খাবারগুলি—থালা সহ গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিল। তার পর জলশুদ্ধ লোটা জলে ফেলিয়া দিল। তার পর কোমর বাঁধিয়া গঙ্গাবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল। লোকে ধরিল না—নিবারণ করিল না। চিত্রার্পিতের ন্যায় অবাক হইয়া কেবল দেখিতে লাগিল। চাঁদার প্রপাত স্থানে সবেগে বীচিচক্র খেলিতে লাগিল। ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর ও ক্ষীণতমে পরিণত হইল, দূরে অতি দূরে গঙ্গাবক্ষে মিশাইয়া গেল—জলে জল মিশাইয়া গেল। কেবল হু হু করিয়া দক্ষিণ বায়ু বহিতে লাগিল—যেন দিক্ দক্ষিণ আবেগে দীর্ঘ উষ্ণ শ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। জোয়ার হইয়া গেল— ভাঁটা হইয়া গেল—আবার জোয়ার হইল। বীচিচক্র আর নাই।

* * * * *

মুসলমানেরা সমবেত হইয়া জাল সাহায্যে মৃতদেহ খুঁজিতে লাগিলেন। সহসা ভারী ঠেকিল। তুলিয়া দেখে ফকীর ও চাঁদা পরস্পরে সুদৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া আছে—প্রাণবায়ু বহু পূর্ব্বে উভয় দেহ ত্যাগ করিয়াছে।

* * * * *

বিস্তর চেষ্টা হইল—আলিঙ্গন শিথিল হইল না—ভাঙ্গা ত দূরের কথা। হিন্দুরা বলিয়াছিলেন চাঁদার দেহ দগ্ধ হইবে। বুঝিলেন বৃথা প্রয়াস। উভয়ের একত্রে গোর হইল। এখনও সে গোর বর্ত্তমান—এখনও সৈয়দ চাঁদের

ফকীরের আগমনের কিছু দিন পরে দেখা গেল চাঁদা ময়রাণী ফকীরের কাছে আসিয়া বসিতে লাগিল। সে নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী লইয়া ফকীরের কাছে আসিত। খাদ্য সামগ্রী ফকীরের সুমুখে ধরিয়া দিয়া নিজে তফাতে বসিত যতক্ষণ না ফকীর চক্ষু খুলিত ততক্ষণ চাঁদা ফকীরের মুখ পানে চাহিয়া চাহিয়া বসিয়া থাকিত। তাহাতে কোন কোন দিন সমস্ত দিন কাটিয়া যাইত।

ফকীর ধ্যানমগ্ন—চাঁদা সুমুখে বসিয়া—ফকীরের বদনমণ্ডলে ধীর স্থির সংলগ্ন দৃষ্টি—খাবার লইয়া বসিয়া আছে—এ দৃশ্য নিত্য দেখা যাইত। ক্রমে নিজের খাবারগুলি আনিয়া চাঁদা ফকীরকে দিতে আরম্ভ করিল। দিনের পর দিন মাসের পর মাস বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল। সৈয়দ ও চাঁদার ব্যবহারও সমভাবে চলিয়াছে। ফকীরের কাছে লোকে যাহা কামনা করে তাহা প্রাপ্ত হয়। ক্রমে ফকীরের যশ দেশরাষ্ট্র হইল। ফকীরের সঙ্গে সঙ্গে চাঁদার নামও জাহির হইল। লোকে চাঁদাকে সমান ভক্তি করিতে লাগিল।

* * * * *

একদিন প্রাতঃকালে অতি প্রত্যুষে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া ফকীর স্ব-স্থানে আসিয়া বসিলেন। যেন বড়ই আনন্দিত। হা হা করিয়া বার বার হাস্য করিলেন, তার পর কোমর বাঁধিয়া এক ছুটে আসন-স্থান হইতে গঙ্গা-তীরে আসিয়া—এখন যেখানে ঘাট—সেই স্থানে আসিয়া ফকীর পুঙ্গব লাফাইয়া জলে পড়িলেন। ঐ যে ডুবিলেন সেই ডুবিলেন—আর উঠিলেন না। কাতার দিয়া লোক দাঁড়াইয়া গেল। সকলের মুখে ঐ কথা। কত অনুসন্ধান হইল কেহ খুঁজিয়া পাইল না। আজ ফকীরের আসন শূন্য।

আজ ফকীরের আসন শূন্য। আজ চাঁদার ফকীর সৈয়দের আসন শূন্য। রাস্তার লোক দাঁড়াইয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশে শূন্য আসন দেখাইয়া দিতেছে। যাহার প্রাণে যাহা আসে সে তাহা বলিতেছে।

যথা সময়ে—দুই প্রহরের পর, থালায় খাবার সাজাইয়া—লোটায় জল লইয়া চাঁদা ময়রাণী আসিয়া ফকীরের আসন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে দেখিল——ফকীরের আসন শূন্য।

থাবার লইয়া বাত্যাহত কদলীর ন্যায় চাঁদা ময়রাণী বসিয়া পড়িল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে, তাহার জিহ্বা ও ওষ্ঠ শুষ্ক। কাষ্ঠ চক্ষে জল নাই।

একজন পথিক বলিল "চাঁদা তোর ফকীর আজ সকালে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়াছে।"

কথা শুনিয়া চাঁদা চমকাইয়া উঠিল। উঠিয়া দাঁড়াইল। আবার বসিল আবার দাঁড়াইল। নিমেষ নিমেষ মধ্যে ইতি কর্ত্তব্য স্থির হইল। চাঁদা থাবার ও লোটা লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ধীর গম্ভীর পদবিক্ষেপে চাঁদা ৬ ভাগীরথীর কূল সন্ধানে চলিল।—সঙ্গে শত শত লোক কৌতূহলী হইয়া চলিল।

চাঁদা ভাগীরথী তীরে উপস্থিত হইয়া কাহাকে প্রণাম করিল—দুইবার প্রণাম করিল। তার পর থাবারগুলি—থালা সহ গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিল। তার পর জলশুদ্ধ লোটা জলে ফেলিয়া দিল। তার পর কোমর বাঁধিয়া গঙ্গাবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল। লোকে ধরিল না—নিবারণ করিল না। চিত্রার্পিতের ন্যায় অবাক হইয়া কেবল দেখিতে লাগিল। চাঁদার প্রপাত স্থানে সবেগে বীচিচক্র খেলিতে লাগিল। ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর ও ক্ষীণতমে পরিণত হইল, দূরে অতি দূরে গঙ্গাবক্ষে মিশাইয়া গেল—জলে জল মিশাইয়া গেল। কেবল হু হু করিয়া দক্ষিণ বায়ু বহিতে লাগিল—যেন দিক্ দক্ষিণ আবেগে দীর্ঘ উষ্ণ শ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। জোয়ার হইয়া গেল— ভাঁটা হইয়া গেল—আবার জোয়ার হইল। বীচিচক্র আর নাই।

* * * * *

মুসলমানেরা সমবেত হইয়া জাল সাহায্যে মৃতদেহ খুঁজিতে লাগিলেন। সহসা ভারী ঠেকিল। তুলিয়া দেখে ফকীর ও চাঁদা পরস্পরে সুদৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া আছে—প্রাণবায়ু বহু পূর্ব্বে উভয় দেহ ত্যাগ করিয়াছে।

* * * * *

বিস্তর চেষ্টা হইল—আলিঙ্গন শিথিল হইল না—ভাঙ্গা ত দূরের কথা। হিন্দুরা বলিয়াছিলেন চাঁদার দেহ দগ্ধ হইবে। বুঝিলেন বৃথা প্রয়াস। উভয়ের একত্রে গোর হইল। এখনও সে গোর বর্ত্তমান—এখনও সৈয়দ চাঁদের

আস্তানা বর্ত্তমান। সৈয়দ এখনও স্বীয় পরিচয়ে চাঁদার নাম ব্যবহার করিতে দিতেছেন। ঘাটের নাম হইল সৈয়দ চাঁদের ঘাট। খুব মাহাত্ম্য উভয়ে এখন দেব দেবী—লোকে সিন্নি দেয়। বিপদে উদ্ধার হইয়া মোকদ্দমা জিতিয়া লোকে সিন্নি দেয়, মঙ্গল কার্য্যেও লোকে সিন্নি দেয়। সিন্নি ছড়াইয়া দেওয়া হয়, বালকেরা কুড়াইয়া লয়।

* * * * *

বলিতে পারেন, মৃত ফকীর কি করিয়া চাঁদা কন্যাকে আলিঙ্গন করিলেন?

শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়।

শিক্ষার সুবিধার জন্য ছাত্র কর্ত্তৃক

দেশভ্রমণ।

জগন্নাথপুর হইতে চাঁইবাসায় ফিরিয়া তোমাকে পত্র দিবার সময় পাই নাই। চাঁইবাসায় একদিন মাত্র বিশ্রাম করিয়া, কাল রাত্রি তিনটার সময় ঘাটশীলায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি।

চারি দিন পরে বৃষ্টি ছাড়িলে, বুধবারে আহারাদি করিয়া পুনরায় গো-যানে আমরা জগন্নাথপুর হইতে বাহির হইলাম। এবার আমরা ৩ জন; যতীন বাবুর পুত্র সুশীলও আমাদের সহিত চাঁইবাসা আসিবার জন্য বাহির হইল। নদীগুলাতে তখনও ভীমবেগে জল নামিতেছে। কোন গতিকে ৩টী নদী পার হইলাম। চতুর্থ নদীটী অতিশয় বৃহৎ, এবং সেই নদীতে তখনও বুকভোর জল প্রবল বেগে নামিতেছে। তাহার উৎপত্তি স্থান পাহাড়গুলি, সেই স্থানের অতি নিকটেই। তখনও নদীর উন্মত্ততা ছুটে নাই, ভীমবেগে গর্জ্জন করিয়া চলিয়াছে। যতীন বাবু আমাদের সহিত দুই জন চাপরাসি দিয়াছিলেন—তাহারা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম হইতে ২০।২৫ জন

কুলি ধরিয়া আনিল। তাহারা গরু ও গাড়ী অতি কষ্টে পার করিয়া দিল। এখন আমাদের উপায় কি? আমরা কি করিয়া পার হইব? সুশীল বালক, তাহাকে কাঁধে করিয়া পর পারে লইয়া গেল। জলে না নামিয়া কুলির সাহায্যে পার হইতে হইবে, আমরা স্থির করিলাম; কিন্তু যদি তাহারা জলের স্রোতে আমাদিগকে ফেলিয়া দেয়? Who is to bell the cat? কে আগে পার হইবে? শেষে সামন্ত পার হইতে রাজি হইল। ছয় জন লোকে, তাহাকে মড়ার মত কাঁধে করিয়া পার করিয়া দিল; কিন্তু সে ভয়ে জড়সড় হইয়া কুঁজা হইয়া ছিল বলিয়া, তাহার পিছনের কাপড় একেবারে ভিজিয়া গেল। তাহার দুর্দ্দশা দেখিয়া আমার শিক্ষা হইল। আমাকে যখন তাহারা ঘাড়ে চাপাইল, তখন আমি প্রকৃত মড়ার মত শরীরটাকে কঠিন করিয়া তক্তার মত পড়িয়া রহিলাম। এইরূপ ভাবে আমাদিগকে নদী পার করিয়া দিয়া, কোলেরা গ্রামে ফিরিয়া গেল। আমরাও অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

৫টার সময় গামারিয়ায় পৌঁছাই। ত্রৈলোক্য বাবুর নিকট বিদায় লইলাম। তিনি বলিলেন পথে বাঘের ভয়, জোড়াপুকুর পৌঁছিতে রাত্রি হইবে, আপনারা আজ এই স্থানেই থাকুন; আমরা তাঁহার কথায় সম্মত না হইয়া, অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সন্ধ্যার এক ঘণ্টা পূর্ব্বে, পথিমধ্যে সব্ ডেপুটী বাবুর সহিত দেখা হইল। তিনি সে দিন গামারিয়ায় Halt করিয়া, পরদিন জগন্নাথপুরে মোকর্দ্দমা করিতে যাইবেন। তিনিও আমাদিগকে বাঘের ভয় দেখাইলেন ও জোরে গাড়ী হাঁকাইয়া, বিশেষ সতর্কতার সহিত সেই বন অতিবাহিত করিতে উপদেশ দিলেন। আমরা পরস্পরে বিদায় গ্রহণ করিলাম। পথের দুই পার্শ্বের জঙ্গল ক্রমেই নিবিড় হইতেছে। গামারিয়া হইতে ৬ মাইল গিয়া জঙ্গল অতিশয় গভীর। পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম সেই স্থানে প্রায়ই রাত্রে বাঘ বাহির হইয়া থাকে। ঠিক সন্ধ্যার সময় আমরা বনের সেই নিবিড় অংশে প্রবেশ করিলাম। চারিদিন ক্রমাগত বৃষ্টির পর, সে দিন আকাশ পরিষ্কার হইয়াছে, চতুর্দ্দশীর চাঁদ আকাশে উদিত হইয়া, বনপথে সহস্র ধারায় কিরণ বিতরণ করিতেছেন। আমরা চন্দ্রালোকে বেশ মনের সুখে গমন করিতেছি। সেই এক ক্রোশ জঙ্গল অতিক্রম

করিতে পারিলে, আর কোন ভয়ের আশঙ্কা নাই, এই কথা পরস্পর বলাবলি করিতেছি। গাড়োয়ানকে জোরে গাড়ী হাঁকাইতে বলিলাম। সামন্তকে বলিতেছি আজ বাঘ বাহির হইবার প্রশস্ত দিন;—চারি দিন বৃষ্টির দরুণ তাহারা আহার অন্বেষণে বাহির হয় নাই, আর আজ আকাশ ছাড়িয়াছে, চাঁদ উঠিয়াছে, জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে, আজ বাঘ নিশ্চয়ই বাহির হইবে। আর দেখ "যেখানে সন্ধ্যা হয়, সেইখানেই বাঘের ভয়; আমরাও ঠিক বাঘের বনে প্রবেশ করিলাম, আর সন্ধ্যাও হইল" ইত্যাদি নানা কথা বলিতে বলিতে আমরা একটু চুপ করিলাম। আমি গাড়োয়ানের ঠিক পশ্চাতে গাড়ীর সম্মুখে বসিয়া আছি; সামন্ত ও সুশীল গাড়ীর মধ্যে। সুশীল ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, সামন্তও অন্যমনস্ক ভাবে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। গাড়োয়ান জোরে গাড়ী হাঁকাইতে হাঁকাইতে, সহসা গরুর দড়ি ধরিয়া টানিয়া, গাড়ীর চলন অনেকটা বন্ধ করিল; এবং আমাকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে একটু দূরে কি দেখাইয়া বলিল "বাবু, দেখ্‌তা নেহি ক্যা একঠো খাড়া হ্যায়" আমি সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম; চোখে বরাবরই কম দেখি, প্রথমে ভাল নজর হইল না, পরে দেখিলাম রাস্তার ঠিক পার্শ্বে, গাড়ী হইতে ৮।১০ হাত মাত্র দূরে, শাল গাছের গোড়ায়, আমাদের দিকে লক্ষ্য করিয়া এক মধ্যমাকারের বাঘ দাঁড়াইয়া আছে। বাঘটা খুব বড় না হইলেও আমাদের মত একটা লোককে অনায়াসে লইয়া যাইতে পারে। গাড়োয়ান একেবারে গাড়ী থামাইল। আমাকে প্রাণপণে চীৎকার করিতে বলিল। আমি ও গাড়োয়ানে বাঘের প্রতি তীব্র লক্ষ্য রাখিয়া, বিকট গগনভেদী চীৎকার করিতে লাগিলাম, পরে সামন্তও চীৎকারে যোগ দিল; সুশীল ছোকরা ঘুমাইতেছিল, আমাদের বিকট চীৎকারে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; সে বুঝিল কোনও বিপদ উপস্থিত, ভয়ে কাঁদ কাঁদ হইয়া, ঘুমের ঘোরে, এক অস্বাভাবিক ভীতিজনক আওয়াজ করিয়া উঠিল। বনমধ্যে ভয়ানক চীৎকার ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। বাঘ বেগতিক দেখিয়া, মুখ ফিরাইয়া ধীরপদবিক্ষেপে বনের মধ্যে চলিয়া গেল। আমরাও নিশ্বাস ফেলিয়া ভগবানকে স্মরণ করিলাম। পরে গাড়োয়ানের মুখে শুনিলাম, সেই সময়েই আর একটী বাঘকে কিঞ্চিৎ দূরে চলিয়া যাইতে সে দেখিয়াছে। তাহারা

শীকারান্বেষণে জোড়ে বাহির হইয়াছিল। মনে ভাবিয়াছিলাম, জগন্নাথপুর যাইবার পথে যে সকল কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহাতেই বুঝি বৃহস্পতিবার-বারবেলার যাত্রার ফলভোগ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু সে ভ্রম কাটিতে অধিক বিলম্ব হইল না। ভগবানের কৃপায় ও গুরুজনদিগের আশীর্ব্বাদে এ যাত্রা পরিত্রাণ পাইলাম। ইহার জন্য কাহাকে ধন্যবাদ দিব, অদৃষ্টদেবীকে, না আমার এই শ্রুতিমধুর কণ্ঠধ্বনিকে? রাত্রে জোড়াপুকুরে অবস্থিতি করিয়া, পরদিন প্রাতে নটার সময় চাঁইবাসায় ফিরিলাম।

তথায় একদিন মাত্র বিশ্রাম করিয়া, মাষ্টার মহাশয়ের পদধূলি গ্রহণ করিয়া, স্কুলের ছাত্রগণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া, মাষ্টার মহাশয়ের দৌহিত্র নির্ম্মলচন্দ্রের নিকট হইতে কি বলিয়া বিদায় লইব, স্থির করিতে না পারিয়া, আসিবার সময় তাহাকে কোন কথা না বলিয়া, নিতান্ত দুঃখিত হইয়া, চাঁইবাসা পরিত্যাগ করিলাম। তুমি আমাকে যেরূপ যত্ন ও স্নেহ কর, নির্ম্মল তাহার অধিক যত্নে আমাকে চিরদিনের মত তাহার নিকট বাধিত করিয়া রাখিল। আর মাষ্টার মহাশয়, আমি তাঁহাকে পিতৃতুল্য ভক্তি করি, তাঁহার যত্ন ও ভালবাসা আমি জীবনে ভুলিব না।

ঘাটশীলায় আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। এখানে আর কোল নাই। এই স্থানের লোকেরা আমাদের বাঙ্গালা কথাও বুঝিতে পারে। ঘাটশীলার লোকেরা প্রায়ই বাঙ্গালির মত। সিংভূম জেলায় তিন প্রকার ভাষা চলিত আছে। ধলভূমের অধিবাসীরা প্রায়ই বাঙ্গালা ভাষায় কথা বলে; সরাইকেলার লোকেরা অধিকাংশই উড়িয়া, তাহারা উড়ে ভাষা বলে; আর কোল্‌হানের কোলগণ, তাহাদের হো ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে। ঘাটশীলা স্থানটী ভারি মনোরম; এই স্থানের জমি চাঁইবাসা প্রভৃতি অঞ্চলের জমি অপেক্ষা অধিক উর্ব্বরা। ধলভূমের স্থানে স্থানে এমন সুন্দর জমি আছে, যে হুগলি ও বর্দ্ধমান জেলার জমি বলিয়া ভ্রম হয়। যে সুবর্ণরেখা নদীগর্ভস্থ স্বর্ণরেণু, দূর দেশান্তরের লোকের নিকটেও চির-পরিচিত, ইংরেজ-বালক মাতৃমুখে যে নদীর ঐশ্বর্য্যের কথা শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, মাতা, সে Better Land কোথায়? "Where the river wanders o'er sands of gold"—সেই স্থানে কি? সেই পুণ্যতোয়া স্রোতস্বিনী সুবর্ণরেখা

পর্ব্বতগাত্র ধৌত করিয়া, সুবর্ণবালুকা বুকে করিয়া, ঘাটশীলার পার্শ্ব দিয়া কল কল নাদে, নাচিতে নাচিতে চলিয়াছেন। ঘাটশীলার কোলেই সুবর্ণ-রেখা; অপর পারেই গভীর জঙ্গল ও পর্ব্বত আরম্ভ হইয়াছে। বনের কোলে কোলে, পর্ব্বতের গাত্র বহিয়া নদী যাইতেছে, নদীতটে দাঁড়াইয়া দেখিলে দৃশ্য অতি চমৎকার। এই দুঃখময় জগৎ যখন অসহ্য বোধ হয়, তখন একবার এই স্থানে আসিয়া উপবেশন কর, স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য দেখ, ঈশ্বরের মহিমা বুঝিবার চেষ্টা কর, তোমরা সংসারের সকল জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া যাইবে। বাড়ী যাইবার জন্য প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে, নতুবা আরও কয়েক দিন, এ স্থানে থাকিয়া ঈশ্বরের কারখানা বুঝিবার চেষ্টা করিতাম। সেদিন সন্ধ্যার পর আমি ও সামন্ত নদীর তটে, পাথরের উপর বসিয়া আছি; ২।১ দিনের মধ্যে বাড়ী ফিরিবার ইচ্ছা। অথচ এই কৈলাস তুল্য স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইতেও ইচ্ছা করে না, এইরূপ নানা কথা মনে মনে তোলাপাড়া করিতে করিতে, হঠাৎ প্রাণের আবেগে, আবৃত্তি করিলাম,—

"But here will sigh thine alder tree,
And here thine aspen shiver;
And here by thee will hum the bee,
For ever and for ever.

A thousand suns will stream on thee,
A thousand moons will quiver;
But not by thee my steps shall be,
For ever and for ever"

সামন্তও অন্যমনস্ক হইয়া স্বভাবের শোভা দেখিতেছিল, আমার আবৃত্তি শুনিয়া তাহার চমক ভাঙ্গিল। সে বলিল "অজয়, তোমার মুখে এই প্রথম ইংরেজী পদ্যের আবৃত্তি শুনিলাম; চিরদিনই ত বাঙ্গালা পদ্যের Recitation শুনিয়া থাকি।" আমি বলিলাম, বাঙ্গালা পদ্য শুনিবে? বলিয়াই আবৃত্তি করিলাম,

"তেয়াগিবে দীর্ঘশ্বাস তব তীরে তরুগণ
কাঁপিবে বৃক্ষের পত্র তব কূলে অনুক্ষণ,
গুণ গুণ অলিকুলে
করিবে তোমার কূলে,

পাখীগণ করিবে ও কূলে কূলে বিচরণ;
চিরতরে দাও মোরে বিদায় এখন।

পড়িবে তোমার বক্ষে সহস্র রবির কর,
ভাঙ্গিবে গড়িবে জলে লক্ষ লক্ষ শশধর;
সব(ই) সম ভাবে রবে,
সমান বাতাস ব'বে,
আমি শুধু ভ্রমিব না তোমার ও তীর'পরে,
তটিনী! বিদায় মাগি আজি চিরতরে!"

সামন্ত আবৃত্তি শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়া বলিল, "বাঙ্গালায় অনুবাদ, Tennyson-এর Original ছাড়াইয়া গিয়াছে; ভারি মধুর লাগিল।" তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে; আমরা দুই জনে তথা হইতে গাত্রোত্থান করিলাম।

শ্রীঅজরচন্দ্র সরকার।

মৃত্যুর পর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমেই অর্জ্জুন শ্রীভগবানকে বলিলেন "হে জনার্দ্দন যদি কর্ম্মযোগ অপেক্ষা বুদ্ধিযোগ (জ্ঞানযোগ)ই শ্রেষ্ঠ, আর ইহাই তোমার অভিপ্রেত তবে আমাকে কি জন্য ঘোর (যুদ্ধরূপ) কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছ? কখনও কর্ম্ম প্রশংসা কখনও জ্ঞান প্রশংসা এইরূপ বিমিশ্র বাক্যে আমার বুদ্ধি যেন মোহিত করিতেছ; যাহাতে আমি শ্রেয়ো লাভ করিতে পারি, এমন একটী নিশ্চয় করিয়া বল।" ইহার উত্তরে ভগবান বলিলেন—

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরাপ্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্॥ ৩
ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥ ৪

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈ গুণৈঃ॥ ৫
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥ ৬
যস্তিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥ ৭
নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহ্য কর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদ কর্ম্মণঃ॥ ৮
যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোয়োং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গ সমাচর॥ ৯

* * * *

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ু রিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥ ১৬।

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে অনঘ এই লোকে দুই প্রকার নিষ্ঠা (মোক্ষ পরতা) আমি পূর্ব্বে (পূর্ব্বাধ্যায়ে) কহিয়াছি। জ্ঞানযোগের দ্বারা সাংখ্য-দিগের এবং কর্ম্মযোগ দ্বারা যোগীদিগের নিষ্ঠা। ৩।

লোকে কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া নৈষ্কর্ম্ম্য অবস্থা লাভ করিতে পারে না; (আসক্তি ত্যাগ ব্যতীত) কেবলমাত্র সন্ন্যাসেই (কর্ম্ম ত্যাগেই) সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। ৪।

কোন অবস্থায় ক্ষণমাত্রও কেহ কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না; প্রকৃতিজ (সত্ত্বাদি) গুণ সকলকেই অবশ করিয়া কর্ম্ম করায়। ৫।

যিনি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকলকে স্মরণ করিয়া থাকেন সেই বিমূঢ়াত্মাকে কপটাচার বলা যায়। ৬।

হে অর্জ্জুন যিনি কিন্তু মন দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান করেন, ফল-কামনাহীন তিনি বিশিষ্ট অর্থাৎ প্রশংসা যোগ্য হয়েন। ৭।

তুমি অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর; যেহেতু কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করা ভাল; কর্ম্মশূন্য হইলে তোমার শরীর যাত্রাও নির্ব্বাহ হইবে না। ৮।

বিষ্ণুর আরাধনার্থ কর্ম্ম ব্যতীত অন্য কর্ম্ম করিলে এই লোক কর্ম্মবন্ধন (কর্ম্মেবদ্ধ) হয়; অতএব হে কৌন্তেয় বিষ্ণু প্রীতার্থ নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর। ৯।

* * * * *

এইরূপে প্রবর্ত্তিত চক্র ইহলোকে যে অনুবর্ত্তন না করে, হে পার্থ, ইন্দ্রিয়াসক্ত পাপজীবন সে বৃথা জীবিত থাকে। ১৬।

শ্রীভগবান আবার বলিয়াছেন।

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি॥ ২০

জনকাদি মহাত্মারা কর্ম্ম দ্বারাই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন। লোক সকলের স্বধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের প্রতিও দৃষ্টি রাখিয়া তোমার কর্ম্ম করা উচিৎ। ২০।

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥ ২২

হে পার্থ আমার কর্ত্তব্য কিছুই নাই; কেন না ত্রিলোকে আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছুই নাই। তথাপি আমি কর্ম্মে প্রবৃত্ত রহিয়াছি। ২২।

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ॥ ৩১।

আমার বাক্যে শ্রদ্ধাবান্ ও দোষদৃষ্টিবিহীন যে সকল মানব আমার এই মত নিত্য অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাও কর্ম্মকারী হইয়াও, সকল কর্ম্ম হইতে মুক্ত হয়েন॥ ৩১।

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ॥ ৩২।

যাহারা, কিন্তু, দোষমাত্রদর্শী হইয়া আমার এই মত অনুষ্ঠান করে না, বিবেকহীন তাহাদিগকে সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ় ও নষ্টহৃদয় বলিয়া জানিবে। ৩২।

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতে র্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥ ৩৩

জ্ঞানবান্ও স্বীয় প্রকৃতির অনুসরণ করেন; সুতরাং ইন্দ্রিয় নিগ্রহ কি করিবে? ৩৩।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥ ৩৫।

সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্মাপেক্ষা সদোষ স্বধর্ম্ম শ্রেয়; স্বধর্ম্মে নিধনও ভাল কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়াবহ। ৩৫।

তারপর শ্রীভগবান গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে এই কথা বলিয়াছেন।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥ ১১
কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা॥ ১২
চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্॥ ১৩
ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে॥ ১৪
এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মাণি তস্মাত্ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্॥ ১৫

যাহারা আমাকে যে ভাবে ভজন করে (অর্থাৎ সকাম বা নিষ্কাম) আমি তাহাদিগকে সেই ভাবেই ভজন করি। হে পার্থ মনুষ্যগণ সর্ব্বপ্রকারে আমারই পথ অনুবর্ত্তন করে (যার যেমন মতি তার তেমনি গতি হয়) ১১।

এই মনুষ্য লোকে কাম্য কর্ম্মের সিদ্ধি প্রার্থীরা আমাকে ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণের ভজনা করেন কিন্তু তাহাদের সিদ্ধি অনিশ্চিত। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মজনিত সিদ্ধি শীঘ্র নিশ্চয়ই জন্মে। ১২।

আমি গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ দ্বারা চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্টি করিয়াছি সত্য, কিন্তু তাহার কর্ত্তা হইলেও আমাকে অব্যয় ও অকর্ত্তা বলিয়া জানিও কেন না আমার আসক্তি নাই। ১৩।

কর্ম্ম সকল আমাকে লিপ্ত করিতে পারে না; কর্ম্মফলে আমার স্পৃহা নাই এই প্রকারে যিনি আমায় জানেন তিনি কর্ম্মে বদ্ধ হন না। ১৪।

এইরূপ তত্ত্ব জানিয়া পূর্ব্বকালীন জনকাদি মুমুক্ষুগণও কর্ম্ম করিয়াছেন, অতএব তুমিও পূর্ব্বতনগণ কর্ত্তৃক পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালে কৃতকর্ম্মই কর। ১৫।

তার পর দেখুন পঞ্চমাধ্যায়ে প্রথম শ্লোকেই শ্রীভগবান বলিতেছেন,

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥

কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মযোগ উভয়ই মোক্ষদায়ক; তন্মধ্যে কর্ম্মসন্ন্যাস অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মযোগই উৎকৃষ্টতর বা শ্রেষ্ঠ।

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩
সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥ ৪
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫

অর্থাৎ—

ইঁহাকেই নিত্য সন্ন্যাসী বলিয়া জানিবে যাঁহার দ্বেষও নাই আকাঙ্ক্ষাও নাই হে মহাবাহো, কারণ দ্বন্দ্বাতীত ব্যক্তি অনায়াসেই সংসার আসক্তি হইতে মুক্ত হয়েন। ৩

বালকেরাই জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগকে পৃথক্ বলিয়া থাকে, কিন্তু পণ্ডিতেরা (জ্ঞানিগণ ও যোগিগণ) বলেন না। একমাত্র সাধন (উভয়ের মধ্যে যে কোন একটী) সম্যক্‌রূপে অবলম্বন করিলে উভয়েরই ফল (মোক্ষ) প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৪

জ্ঞানিগণ যে স্থান (মোক্ষ) লাভ করেন; কর্ম্মযোগীরাও তাহাই প্রাপ্ত হন। যিনি সাংখ্য ও যোগকে এক রূপে দেখেন, তিনিই সম্যক্ দর্শন করেন। ৫

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা। ১০
কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১১

পরব্রহ্মে কর্ম্ম সমাধানপূর্ব্বক কর্ম্ম জন্য ফল কামনার আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া যিনি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, পদ্মপত্র যেমন জলমগ্ন হইয়াও জলে

নির্লিপ্ত থাকে, তদ্রূপ সেই কর্ম্মানুষ্ঠানকারী পুরুষ কর্ম্মরাশি মধ্যে নিমগ্ন হইলেও কর্ম্ম জন্য পাপপুণ্যে নিত্য নির্লিপ্ত থাকেন। ১০

যোগিগণ ফল কামনায় সঙ্গ ত্যাগ করিয়া আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত শরীর দ্বারা (স্নানাদি দ্বারা) মনের দ্বারা (ধ্যানাদি) বুদ্ধিদ্বারা (তত্ত্বনিশ্চয়াদি দ্বারা) এবং কেবল ইন্দ্রিয়াদির দ্বারাও (শ্রবণ কীর্ত্তনাদি) কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ১১

তৎপরে শ্রীভগবান ৫ম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে বলিয়াছেন—

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ২৯

সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, সর্ব্বলোক মহেশ্বর এবং সর্ব্বভূতের সুহৃৎ স্বরূপে আমাকে অবগত হইয়া তিনি (জীব) শান্তি (মুক্তি) লাভ করেন।২৯

* * * * *

তার পর ষষ্ঠাধ্যায়ে—

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ ॥ ১
যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসন্ন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২
আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩

শ্রীভগবান কহিলেন, যিনি কর্ম্মফলের অপেক্ষা না করিয়া অবশ্য "কর্ত্তব্য" বলিয়া বিহিত কর্ম্ম করেন, তিনিই সন্ন্যাসী এবং যোগী (একাধারে)। নিরগ্নি (অগ্নিসাধ্য ইষ্টাদি কর্ম্মত্যাগী) বা অক্রিয় (অনগ্নিসাধ্য পূর্ত্তাদি কর্ম্ম-ত্যাগী) তাঁহার মত যোগী নহেন। ১

হে পাণ্ডব, পণ্ডিতগণ যাহাকে সন্ন্যাস বলিয়া কীর্ত্তন করেন, তাহাকেই তুমি যোগ বলিয়া জানিও; কারণ প্রথমতঃই সঙ্কল্পের (কামনার) সন্ন্যাস (ত্যাগ) না করিলে কেহই যোগী হইতে পারেন না। ২

তপস্বিভ্যোঽধিকোযোগী জ্ঞানিভ্যোপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন ॥ ৪৬

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥ ৪৭

এইরূপ কর্ম্মযোগী পুরুষ তপস্বিগণ হইতে শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানিগণ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং কর্ম্মিগণ (সকাম উপাসকগণ) হইতেও শ্রেষ্ঠ আমার অভিমত। অতএব অর্জ্জুন তুমি যোগী হও অর্থাৎ সেই কর্ম্মযোগের অনুসরণ কর। ৪৬

শ্রদ্ধাবান্ যে ব্যক্তি মদগতচিত্ত দ্বারা আমাকে ভজনা করেন, তিনি সকল যোগীদের মধ্যে যুক্ততম (অতি শ্রেষ্ঠ যোগী) এবং ইহাই আমার অভিমত। ৪৭

শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়।

নদীয়া-কাহিনী।

দেবপাল নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। মুসমলানগণকে তিনি প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। কিন্তু তাহাতে কি আসিয়া যায়—বঙ্গদেশ তখন মুসলমান অধিকৃত, মুসলমানগণের প্রতাপ তখন অপ্রতিহত। বহুদিন শান্তির ক্রোড়ে বিলাস স্রোতে ভাসমান থাকিয়া তাহারা অত্যন্ত অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিল, এমন কি স্ত্রীলোকগণের উপর অত্যাচার করিতে কুণ্ঠা বোধ করিত না। রাজা দেবপাল এই সকল উচ্ছৃঙ্খলতা অমার্জ্জনীয় মনে করিতেন, তাই তিনি কঠোর হস্তে তাঁহার নিজ অধিকারভুক্ত মুসলমান-গণের এই সকল অত্যাচার দমন করিতে প্রবৃত্ত হওয়ায় তদানীন্তন বঙ্গেশ্বরের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয় এবং কয়েকবার কয়েকটী ক্ষুদ্র সংঘর্ষে তিনি মুসলমান সৈন্যগণকে বিধ্বস্ত করেন। প্রতিহিংসাপরায়ণ নবাব এই রূপে একজন ক্ষুদ্র ভুঁইয়ার নিকট পরাস্ত হওয়ায় দারুণ হিংসানলে প্রজ্জ্বলিত হইয়া দেবগ্রামের চতুষ্পার্শ্বে বহু সৈন্য সমাবেশ করিলেন। দিল্লীশ্বরের বিনানুমতিতে এক জন ভুঁইয়ার সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া তাহার রাজ্য

বিধ্বস্ত করিলে পাছে সম্রাটের কোপদৃষ্টিতে পতিত হইতে হয়, সেই ভয়ে বঙ্গেশ্বর দেবগ্রাম অবরোধ পূর্ব্বক রাজা দেবপালের বিরুদ্ধে বহু গ্লানিকর কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া দিল্লীদরবারে দূত প্রেরণ করিলেন এবং দিল্লীশ্বরের আদেশের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে রাজা দেবপালও বঙ্গেশ্বরের এই অযথা অত্যাচারের প্রতিবিধান মানসে দিল্লীর খাস দরবারে আরজ করিতে গমন করিলেন। গমনকালে তিনি জয় ও বিজয় নামে দুইটী বার্ত্তাবহ কপোতকে সঙ্গে লইয়া বলিয়া যান যে "যদি এই শ্বেতকায় জয় আমার আসিবার পূর্ব্বে প্রত্যাগমন করে—তবে সকলে জানিও যে আমি দরবারে জয়লাভ করিয়া প্রত্যাগমন করিতেছি, কিন্তু জয়ের পরিবর্ত্তে যদি কৃষ্ণকায় বিজয় প্রত্যাবর্ত্তন করে তবে জানিও আমার নিধন হইয়াছে। তখন সকলে দুর্দ্দান্ত মুসলমান হস্তে আত্মরক্ষার উপায় করিও।" নবাব প্রেরিত দূত ও দেবপাল উভয়ে একই সময়ে দিল্লীশ্বরের সমীপে উপস্থিত হন। দিল্লীশ্বর দেবপালের তেজগর্ব্বব্যঞ্জক বপু, অসীম সাহস, নির্ভীক ভাব ও উদার চরিত্র দেখিয়া তাঁহার প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হন ও তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বঙ্গেশ্বরকেই মুসলমানগণ কৃত অত্যাচারের প্রতিবিধান করিতে পরামর্শ দিয়া দেবপালকে এক ফরমান দ্বারা মহারাজ উপাধি ভূষিত করিয়া কয়েকখানি পরগণার স্বামীত্ব প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্মানিত করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ দেন। মহারাজা দেবপাল এইরূপে দিল্লীর দরবারে অপ্রত্যাশিতরূপে সাফল্য ও সম্মান লাভ করিয়া বঙ্গাভিমুখে রওনা হন এবং কপোতবাহী দাসকে শ্বেতকায় জয়কে মুক্ত করিয়া দেবগ্রাম অভিমুখে প্রেরণ করিতে আদেশ করেন। ঐ কপোতবাহী দাস বঙ্গেশ্বরের দূতের নিকট বহু অর্থ উৎকোচ লইয়া জয়ের স্থলে বিজয়কে মুক্তি প্রদান করে। দেখিতে দেখিতে শিক্ষিত কপোত শনৈঃ শনৈঃ দেবগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হয়। রাজা দেবপালের পৌরজনবর্গ সেই অশুভ দর্শন কৃষ্ণকায় কপোতকে প্রত্যক্ষ করিয়া হাহাকার করিয়া উঠিলেন এবং রাজা দেবপালের নিধন নিশ্চয় বুঝিয়া মহিলাগণ দুর্দ্দান্ত মুসলমান হস্ত হইতে আপনাদের পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্য সকলে অপূর্ব্ব বেশভূষা ও অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া প্রাসাদ প্রাঙ্গণস্থিত স্বচ্ছসলিলা খিড়কী

পুষ্করিণীতে ও সাগর দিঘীতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। তখন পুরুষগণ কৃপাণ হস্তে গড়ের দ্বার মোচন করিয়া প্রচণ্ড বেগে সেই মুসলমান সৈন্য ব্যূহের মধ্যে পতিত হইলেন এবং দেখিতে দেখিতে সেই মুষ্টিমেয় হিন্দু-সেনা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। তখন মুসলমানগণ বিনা ক্লেশে সেই অরক্ষিত পুরী প্রবেশ করিয়া যেখানে যাহা পাইল অপহরণ ও ধ্বংস করিল। এ দিকে মহারাজা দেবপাল মহোল্লাসে শূন্যে কত অট্টালিকা রচনা করিতে করিতে আগমন করিতেছিলেন, এক্ষণে দূর হইতে মুসলমানগণের বিজয় নিনাদ শুনিয়া ও স্বীয় পুরী তাহাদের অধিকৃত দেখিয়া বজ্রাহতবৎ সেই স্থানে মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মুর্চ্ছান্তে দ্রুত অশ্ব চালনা করিয়া পুরী প্রবেশ করিলেন এবং আপনার শরীর রক্ষক সেনা কয়জন ও স্বয়ং কিয়ৎকাল অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়া শত শত মুসলমান সেনা ধ্বংস পূর্ব্বক আপনিও নিহত হইলেন। এইরূপে বঙ্গের আর একটী রত্ন আপনার পূর্ণজ্যোতি বিকীরণ না করিতেই অকালে কালের অতল গর্ভে নিমজ্জিত হইলেন এবং এইরূপে সেই দুর্ম্মুখ সন্ন্যাসীর দারুণ অভিসম্পাত কার্য্যে পরিণত হইল।

এইরূপে বাঙ্গালার ভুঁইয়া রাজাগণ একে একে মোগল শাসনাধীনে আসিলেন বটে কিন্তু রাজ্যশাসন সম্বন্ধে মুসলমানগণের প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক রহিল না। তদানীন্তন ভূস্বামীগণ রাজ্যের সর্ব্ব প্রকার শাসন কার্য্য স্বাধীনভাবে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণ কেবল নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন ও সর্ব্বদা আমোদ আহ্লাদে কালাতিপাত করিতেন।

এইরূপে নদীয়া সে সময়ে আদৌ মুসলমান শাসনাধীন থাকিলেও উহা প্রত্যক্ষত কৃষ্ণনগরাধিপতিগণের শাসনাধীন হইল। মানসিংহকে বাঙ্গালা বিজয়ে সহায়তার পুরস্কারস্বরূপ ভবানন্দ মজুমদার সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে বহু সম্মান ও এক ফরমান দ্বারা ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে নদীয়া, মহৎপুর, মারূপদহ, লেপা, মুলতানপুর, কাশিমপুর, করেশা, মসুণ্ডা প্রভৃতি চতুর্দ্দশ পরগণার স্বামীত্ব প্রাপ্ত হইয়া রাজ্যশাসনে মনোনিবেশ করিলেন। এই সময় হইতে নদীয়া, তদ্বংশীয়গণের দ্বারা স্বাধীনভাবে শাসিত হইতে থাকে। ভবানন্দ বাগোয়ান হইতে মাটিয়ারিতে রাজধানী স্থাপনা করেন।